অদ্ভুত গোয়েন্দা গল্প

[কয়েকটি গোয়েন্দা গল্পের সংকলন]

রাধারমণ রায়

৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড,·কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রকাশক
পি. সাহা
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৭

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ, ১৩৪৭

মুদ্রাকর
অন্নপূর্ণা পাল
শ্রীদুর্গা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩ রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

যে সব গল্প এতে আছে ঃ

স্মাগলার

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছবির চেহারার সঙ্গে নিজের চেহারাটা আর একবার মিলিয়ে নিলাম। সবই ঠিক আছে। ঘাড় পর্যন্ত নেমে যাওয়া মাথাভর্তি লম্বা, রুক্ষ চুল। এক মুখ বড়ো বড়ো দাড়ি গোঁফ। গায়ে গেরুয়া রঙের ঢিলা পাঞ্জাবি। চুল-দাড়ির রঙের সঙ্গে পাঞ্জাবির রঙ প্রায় মিলে গেছে। পরনে পাথলুন। পায়ে কোলাপুরী চটি। বাঁ দিকের কাঁধে কাপড়ের তৈরী ঝোলানো ব্যাগ। ডান হাতের বগলে খবরের কাগজে মোড়া একটি শতরঞ্চি এবং অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি জিনিস।

সবই ঠিক আছে। কেবল রুদ্রাক্ষের মালাটা এখনো গলায় দেওয়া হয়নি। তাছাড়া দুরূহ তন্ত্রশাস্ত্রের কয়েকটি বইও নিতে ভুলে গেছি। এগুলি খুব কাজে লাগবে।

মালাটা গলায় দিয়ে আয়নায় প্রতিফলিত নিজের চেহারাটা আর একবার দেখে নিলাম। এবারে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম।

আশ্চর্য রকম মানিয়েছে আমাকে। অবশ্য বেশবাসের চেয়ে আমার চেহারাটাই বেশী কাজে লেগেছে এখন। ছ-ফুটের মত দীর্ঘ শরীর, একটু রোগা। গায়ের রঙ অনেকটা সাহেবদের মত ফর্সা। চোখ দুটো টানা টানা, ঈষৎ নীল। খানিকটা বাদামী রঙের চুল-দাড়ি। প্রকৃতিদত্ত এই সম্পদগুলো না থাকলে ছদ্মবেশ ধারণ করা হয়তো কেবল পণ্ডশ্রমই হতো।

ছদ্মবেশ?—হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি এখন আর প্রতাপাদিত্য রোডের সেই গণেশ হালদার নই। সুস্মিতার হত্যা-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হওয়ার পর উল্টে যাওয়া যে গণেশ একবার সোজা হয়েছিল, তাকে নিজের হাতে আর একবার আমি উল্টে দিলাম।

তাহলে আমি এখন কে ?—ছবির পরিচয়ই আমার পরিচয়। আজ থেকে আমার কোনো নিজস্ব পরিচয় নেই। নকল পরিচয় নিয়েই আমাকে আজ উঠতে হবে রজনী সেন রোডের নতুন বাসায়, যার তাৎপর্য একটি অখণ্ড ভাড়াবাড়ি।

যদিও বাসাটা এখনো হাতে আসেনি, তবে ভদ্রলোকের সঙ্গে ফোনে যা কথাবার্তা হয়েছে, তাতে সেটা হাতে আসারই কথা। কারণ, বাড়ির মালিক এই খ্রীষ্টান ভদ্রলোকটি তিন মাসের ভাড়া জমা রেখে শ্বেত-অশ্বেত যে কোনো সন্ন্যাসীকেই বাড়িটি ভাড়া দিতে রাজী আছেন। আসলে ভাড়াটিয়ার চেয়ে ভাড়ার সঙ্গে সম্পর্ক পাতাতেই তিনি বেশী আগ্রহী।

অবশ্য গোয়েন্দা-ইন্সপেক্টর সন্তোষ বিশ্বাসের প্রচেষ্টাই এক্ষেত্রে বেশী কার্যকর হয়েছে। প্রথমতঃ, তাঁর কথা বাড়ির মালিক অবহেলা করতে পারেননি। দ্বিতীয়তঃ ভাড়ার পুরো টাকাটাই আপাততঃ সন্তোষবাবু দিয়ে দেবেন। কেন দেবেন, তা এখন বলব না। শুধু জেনে রাখুন, সন্তোষবাবুর একটি বিশেষ কাজে সাহায্যের জন্যই আমার এই বেশ-বদল, বাসা-বদল।

বাসা বদল বললে সবটা ঠিক বলা হয় না। কারণ বর্তমানে কলকাতায় আমার নিজস্ব কোনো আস্তানা নেই। সাত বছর আগেই প্রতাপাদিত্য রোডের সেই বাসাটা আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে। এখন সেখানে এক মাদ্রাজী ভদ্রলোক জুড়ে বসেছেন। আর আমি, স্বয়ং গণেশ হালদার (যে নিজেকে আর একবার উল্টে দেওয়ার কাজ প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে), আশ্রয় নিয়েছি সন্তোষবাবুর বাড়িতে।

সুমিতা-হত্যার দায় থেকে মুক্ত হওয়ার পর আমার একটি চাকরি বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কারণ, পরের ঘাড়ে বেশিদিন তো নির্ভর করা চলে না। এর মধ্যে আরও একটা বিরাট দায় থেকে আমি মুক্ত হয়েছিলাম। পারিবারিক দায়িত্ব বলতে আমার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আমার আইবুড়ো বোনগুলির বিয়ে হয়ে গেছে, ভাইটির মিলিটারিতে চাকরি হয়েছে এবং বাপ-মা আমার

প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। এ খবর আমি সোনামাটি গ্রামে নিজে গিয়ে জেনে এসেছি। (পারিবারিক কথা ভাবতে ভাবতে মনটা আমার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে।)

দীর্ঘ দিন পরে আমাকে গ্রামে ফিরতে দেখে অনেকে যেমন আশ্চর্য হয়েছিলেন, তেমনি আমার বাপ-মায়ের মৃত্যুর খবর দিয়ে আমারপ্রতি সমবেদনাও প্রকাশ করেছিলেন। যাঁদের সঙ্গে কথা হল, তাঁরা সবাই প্রায় বয়স্ক লোক, গ্রাম্য সম্পর্কে আমার কাকা, জ্যাঠা ইত্যাদি। কথা বলার সময় একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম, আগে এঁরা আমাকে 'তুই' বলতেন, এবারে বলেছিলেন 'তুমি'। আগে সবাই আমাকে ডাকনাম ধরে ডাকতেন, এবার কেউ কেউ প্রথমে বেনামেই ডাকছিলেন। হয়তো ভাবছিলেন, ডাকনাম ধরে ডাকাটা ঠিক উচিত হবে না। (গ্রামের প্রায় ছেলেরই ডাকনাম এবং ভালনাম, দুটো নামই থাকে। যৌবনপ্রাপ্তির পর ছেলে যখন 'তুই' থেকে 'তুমি' হয়, তখন তার ছোটোবেলাকার ডাকনাম অবলুপ্ত হয়, আর তার ভালনামটি খ্যাত হয়ে ওঠে। যেমন—ছোটোবেলাকার পটলা হয় বিজন, পচা হয় পঞ্চানন ইত্যাদি।) বোধকরি আমার 'গণেশ' নামটি তাঁদের কাছে অজ্ঞাত থাকায় তাঁরা আমায় 'সাহেব' বলেই ডেকেছিলেন।

'সাহেব' আমার ছোটোবেলার ডাকনাম। নামকরণ করেছিলেন ঠাকুমা। উদ্দেশ্যটা ছিল হয়তো তামাশা। এখন যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, তাহলে হয়তো বুঝতে পারতেন নামের সঙ্গে ব্যক্তির সামঞ্জস্য কেমন অপূর্ব হয়ে উঠছে। (বলা বাহুল্য, ব্যক্তির সঙ্গে নামের সামঞ্জস্য প্রায়ই থাকে না। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখা না হলেও কৃষ্ণাঙ্গ ছেলের নাম প্রায়ই গৌরাঙ্গ শোনা যায়।) এই কলকাতায় যদিও কেউ আমার 'সাহেব' নামটি জানে না, কিন্তু আমার চেহারা দেখে অনেকে পরোক্ষভাবে আমাকে 'সাহেব' বলে মন্তব্য করেছে।

তন্ত্রশাস্ত্রের বই ক'টি ব্যাগে ভরে নিলাম। আপাততঃ এগুলিতেই আমার চলবে। তা ছাড়া বাড়ি ভাড়া নেওয়ার আগেই সংসারটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া চলে না। সন্তোষবাবু বলেছেন, আজকের রাতের মধ্যেই আমার অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি দিয়ে আসবেন এবং একটি লোকও দেবেন, যে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডী পাঠ পর্যন্ত সব কাজেই আমাকে সাহায্য করবে।

মনে মনে নিজের নামটি এবার স্মরণ করে নিলাম। না, না, 'গণেশ হালদার' নয়, উইলসন উডরো। এই নামটি সন্তোষবাবুর খুব পছন্দ হয়েছে। অবশ্য আমিই এটি ডিকসনারি থেকে বেছে নিয়েছি। যে ব্যক্তির কাছ থেকে নামটি ধার করেছি তিনি ১৮৫৬—১৯২৪ সনের লোক। যে সে লোক ছিলেন না তিনি! আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইনি শান্তির দূতরূপে খ্যাতিলাভ করেন। অবশ্য আমি নিজেও খুব শান্তিপ্রিয়। আর কোনো একটি অশান্তির মূলোচ্ছেদের জন্যই আমার এই নবরূপ।

বাসা ঠিক করতে বেশী বেগ পেতে হল না। এদিক ওদিক, নানাদিক ঘুরে একটু রাত করে রজনী সেন রোডের বাসায় আশ্রয় নিলাম। লেকের কাছেই, অথচ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের প্রায় ওপরেই, ঠিক যেখানে দেশপ্রাণ প্রাইমারী ইস্কুলটি আছে, তার উল্টো দিকে আমার বাসা। রাস্তার ওপরেই সম্পূর্ণ পৃথক্ একটি দোতলা বাড়ি। প্রতিবেশীদের সবাই প্রায় অবাঙালী। সন্তোষবাবু নিজেই দেখেশুনে এই অঞ্চলটা আমার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, এদিকটায় শুধু যে অবাঙালীরা বাস করে তাই নয়, বেশ কয়েকজন অভারতীয় ব্যক্তিও থাকেন। এই অভারতীয়দের মধ্যে কিছু আছেন আমেরিকান, কিছু ইউরোপিয়ান। অবশ্য এঁরা সবাই প্রবাসী, কলকাতায় চাকরি করেন। তাছাড়া আছেন কিছু মিশ্রিত ব্যক্তি, যাঁদের বলা হয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। চৌরঙ্গী এলাকা ছাড়া দক্ষিণ কলকাতার এই অঞ্চলটা এই সব লোকেরা বসবাসের জন্য বেছে

নিচ্ছেন। সন্তোষবাবু আরও বলেছিলেন, হিপি সম্প্রদায়ের কিছু লোকও আমার বাসার কাছাকাছি আড্ডা গেড়ে আছেন।

আমি বাসায় পৌঁছানোর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে সন্তোষবাবু নিজে গাড়িতে করে আমার অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দিয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে কয়েকটি নির্দেশও দিয়ে গেলেন। যেমন, খবরের কাগজ থেকে কেটে নেওয়া যে-ছবির জীবন্ত আকার আমি ধারণ করেছি, তার নামটি আমাকে প্রতিদিন জপ করতে হবে। আমার আসল নাম যে উইলসন উডরো নয়, তা যথা সময়ে প্রকাশ করতে হবে ইত্যাদি। আর একটি দামী কথা তিনি বলেছেন, আমার জন্য নির্দিষ্ট করা একটি প্রাইভেট কার সব সময় নিকটস্থ পেট্রোল পাম্পে রেডি থাকবে। পাঞ্জাবী ড্রাইভারের মাথায় থাকবে লাল পাগড়ি বাঁধা। এই ট্যাক্সি ছাড়া অন্য কোনো যানবাহনে ওঠা আমার নিষেধ। গাড়ির নম্বরটাও আমাকে দিয়েছেন।

[রহস্য-কাহিনী বলতে যা বোঝায়, আমার এই গল্প যদি তার পর্যায়ে না পড়ে, আমি দুঃখিত। সত্য ঘটনাকে আমি নাম ধাম পাল্টে যথাযথভাবে বলবার চেষ্টা করছি। কিন্তু তাকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে আজগুবী করে তোলার চেষ্টা আমি করব না।

গল্পের খাতিরেই প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে একটু তত্ত্বকথা আমাকে লিখতে হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, সত্য ঘটনা যদি অবাস্তব হয়, তবে তা সাহিত্য নয়। আবার মিথ্যা কাহিনী যদি বাস্তব হয়, তবুও তা সাহিত্য হবে। আর রহস্য-কাহিনীও এমন হওয়া উচিত, যা অন্ততঃ কিছুটা সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে। তবে আমার এ কাহিনী যে সাহিত্য নয়, তা আমি জানি। কারণ, আমি নিজেই তো সাহিত্যিক নই। স্বাক্ষর, উইলসন উডরো ওরফে গণেশ হালদার।]

পরের দিন সকালবেলা খবরের কাগজ খুলেই দেখি একটি হিপির আড্ডার খবর বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয়েছে। পাশেই একটি ছবি।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকজন হিপি ছেলেমেয়ে গোল হয়ে বসে আছে। এদের মধ্যে একজনকে আমার চেনা-চেনা মনে হল। সন্দেহ দূর করার জন্য আগের সংগৃহীত ছবিটির সঙ্গে একে মিলিয়ে দেখলাম। গরমিল বিশেষ কিছু পেলাম না।

এই সময় একটি নাম আমার মনে পড়ল, সন্তোষবাবু যেটি আমায় জপ করতে বলেছিলেন তা হল লংফেলো। এই জন লংফেলোর ছদ্মবেশ আমাকে ধারণ করতে হয়েছে। এরই যমজ ভাই হচ্ছে চাইল্ড লংফেলো। অর্থাৎ আমার আসল নাম যখন উইলসন, আর ছদ্মনাম লংফেলো (জন)। জনকে আমি দেখিনি। যতদূর শুনেছি, চাইল্ডের চেহারার সঙ্গে তার হুবহু মিল আছে। চোখ, মুখ, নাক, এমনকি চুলের পর্যন্ত মিল আছে। চাইল্ডকেও আমি স্বচক্ষে দেখিনি। কেবল তার ছবি দেখেছি। বলা বাহুল্য, তার ছবির চেহারার সঙ্গে মিল রেখেই আমি জনের ছদ্মবেশ ধারণ করেছি। ভুল ত্রুটি হয়তো অনেক আছে। তা যথা সময়ে শুধরে নিতে হবে।

খবর পেয়েছি, জন লংফেলো এখনো আমেরিকায় আছে। সে কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার। সে বরাবর হিপি সম্প্রদায়ের নিন্দা করে এসেছে। তার ধারণা, এই সম্প্রদায়ের লোকেরা সি-আই-এর এজেন্ট। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রচুর টাকা খরচ করে অকমিউনিস্ট দেশগুলিতে এদের ছড়িয়ে দিয়েছে। একবার একটি সাময়িক পত্রিকায় হিপিদের নিন্দা করে জন একটি প্রবন্ধও লিখেছিল। জনের সম্বন্ধে এর বেশী কিছু খবর আমি জানি না। তবে তার বাপ-মা এখনো বেঁচে আছেন। বাবার নাম স্যামুয়েল লংফেলো। ইনি কালিফোর্নিয়ার একটি কলেজের একজন অধ্যাপক। জনের মায়ের নাম রোজী লংফেলো। ইনি একজন প্রাক্তন সরকারী কর্মী। বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। জন আর চাইল্ড ছাড়া তাঁদের আর কোনো সন্তানাদি হয়নি। চাইল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাচেলার কোর্স অসমাপ্ত রেখেই ভারতে চলে এসেছিল। এ-ব্যাপারে জনের ধারণা ছিল, চাইল্ড সি-আই-এর চাকরি নিয়ে ভারতে আসেনি।

সে এসেছিল ইয়াঙ্কি সভ্যতায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভারতীয় সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছে জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে। স্বদেশে থাকতেই সে ভারতীয় সন্ন্যাসী যোগেশ মহারাজের নাম শুনেছিল।

যোগেশ মহারাজ এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক। ইনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সন্ন্যাসী। দেশ-বিদেশের হিপিরা এঁকে গুরু বলে মেনে নিয়েছেন। একদা চাইল্ড লংফেলো এঁর কাছেই দীক্ষা নিতে ছুটে এসেছিল সুদূর কালিফোর্নিয়া থেকে ভারতবর্ষে।

লংফেলো পরিবার সম্পর্কে এর বেশী কোনো খবর সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। চাইল্ড লংফেলোর কোনো সঠিক খবরও পাওয়া যায়নি। তবে সে যে এদেশের কোনো হিপি-দলের নায়ক হয়ে উঠেছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পুলিসের ধারণা, সে এখন বাংলাদেশেই (পশ্চিমবঙ্গে) আছে, এবং খবরের কাগজে ছাপা একটি বিশেষ ছবিই চাইল্ডের ছবি।

আর একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ খবর এই যে, যোগেশ মহারাজ তাঁর কাশীধামের আখড়া ছেড়ে কলকাতায় এসে নতুন আড্ডা তৈরি করেছেন। কেওড়াতলার রাজার ঘাটে একেবারে আদি গঙ্গার ধার ঘেঁষে তৈরি করা হয়েছে একটি ছোটো কুঁড়েঘর। হিপিদের এখানে ঘন ঘন যাতায়াত করতে দেখা যায়। গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর তারা নানারকম কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা যোগাভ্যাস করে। পুলিস এই আড্ডাটির উপর বিশেষ নজর রেখেছে।

খবরের কাগজটায় আবার চোখ বুলালাম। ছবির নীচেতেই হিপি-আড্ডার একটি সংক্ষিপ্ত খবর বেরিয়েছে। তা হল—রানাঘাটে হিপি-দের একটি আড্ডা গড়ে উঠেছে। এরা কিছুদিন ধরে চূর্ণি নদীর উপর বজরায় বাস করছে। স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে এরা কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। দলে দলে লোক এসে এদের দেখে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ এদের সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করছে।

আমি মনে মনে স্থির করলাম, আজ বিকেলেই এদের আড্ডায়

একবার হানা দিতে হবে। কিন্তু তার আগে আমাকে একবার যেতে হবে কেওড়াতলায় যোগেশ মহারাজের কাছে দীক্ষা নিতে।

সকালের চা-পর্ব শেষ করে নির্দিষ্ট গাড়িতে উঠে চলে এলাম রাজার ঘাটে। এ সময় ভিড় কম ছিল। মহারাজ তখন ছিলেন ধ্যানে নিমগ্ন। কয়েকজন হিপির অনুসরণ করে আমিও ধ্যানে নিমগ্ন হলাম। ধ্যান ভাঙল প্রায় মিনিট পনেরো পরে।

মহারাজ একে একে সকলের মুখগুলো দেখে নিলেন। আমার দিকে তাকাতেই আমি ইংরেজিতে বললাম, 'আমি কালিফোর্নিয়া থেকে এসেছি ভারতীয় তন্ত্রসাধনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। তা ছাড়া মনে মনে আমি যোগেশ মহারাজকে গুরু বলে মেনে নিয়েছি। এখন বাকি আছে কেবল তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া।' আরও বললাম 'আমি ভাঙা হিন্দী এবং বাংলা বলতে পারি।'

মহারাজ আমার কথায় খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং কোনো এক মঙ্গল-বার দুপুর রাতে তাঁর কাছে যেতে বললেন। আজ রবিবার। কাজেই পরশুদিন যাব বলে দিনস্থির করলাম। এরপর নবাগত কয়েকজন হিপি ছেলেমেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। এরাও এসেছে মহারাজের কাছে দীক্ষা নিতে। আলাপের সময় লক্ষ্য করলাম তাদের চোখে মুখে যেন সামান্য একটু সন্দেহের ছায়া ফুটে উঠেছে। তা দূর করার জন্য হেসে বললাম, আমার মা ছিলেন আমেরিকা-প্রবাসী ইণ্ডিয়ান। আমার কথায় তারাও হেসে উঠল এবং আমাকে সহজভাবে গ্রহণ করল। খানিক পরে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম রজনী সেন রোডে।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। আমার ঘরে টেলিফোনের অ্যারেঞ্জমেণ্ট ছিল। ফোনে সন্তোষবাবুকে সকালবেলার সমস্ত ঘটনা জানালাম। এ সময় তিনি লালবাজারে ছিলেন।

যাই হোক, আমার রানাঘাট যাওয়া মঙ্গলবার পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। এর মধ্যে খানিকটা প্রস্তুতি করে নিলাম। রাত্রিবেলা সন্তোষবাবু এলে তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ বসে যুক্তি করলাম। ঠিক হল

পাঞ্জাবী ড্রাইভার বীর সিং সহকারীরূপে আমার সঙ্গে যাবে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা বাঙালীর বেশেই যাব। মঙ্গলবারের শেষ রাতে প্রাইভেট গাড়িতে উঠে যেতে হবে।

কিন্তু মানুষ যা প্ল্যান করে, তাকে সবটা বাস্তবে রূপ দেওয়া যায় না। যত সহজে চাইল্ড লংফেলোকে কায়দায় আনব ভেবেছিলাম, তা হবার নয়। কারণ, আজ রাত্রেই একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল।

কিসের একটা শব্দে ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। পাশ ফিরতে গিয়ে চোখে পড়ল, একটি ছায়ামূর্তি আমার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। স্বপ্ন কি সত্য তা যাচাই করবার জন্য ভালভাবে তাকাতেই দেখলাম, আর একটি ছায়ামূর্তি ভিতরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করল এবং আগের মূর্তিকে নিঃশব্দে অনুসরণ করল। প্রথম মূর্তি যখন আমার প্রায় কাছে চলে এসেছে, তখন আমি চিৎকার করব কি না ভাবছি, ঠিক তখনই সে পিঠের উপর হাত রেখে অস্ফুট আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং গোঙাতে লাগল। দ্বিতীয় মূর্তি তৎক্ষণাৎ সুইচ টিপে আলো জ্বালল এবং মাথার লাল পাগড়ি দিয়ে প্রথম জনের মুখ বেঁধে ফেলল। এক সঙ্গে দু'জনকেই আমি চিনতে পারলাম। প্রথম ব্যক্তি সকালে রাজার ঘাটে দেখা হিপিদের একজন এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি স্বয়ং বীর সিং, অর্থাৎ আমার সহকারী।

বীর সিং ছোটো একটি লোহার রড দিয়ে আগন্তুকের পিঠে এমনভাবে গুঁতো দিয়েছিল যে, বাবাজীর সংজ্ঞা লোপ পেয়েছিল।

কেন জানি না, আমার মনে হল, আগন্তুককে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন অপরিসীম। কাজেই বীর সিংকে থামাতে হল। একটু জল-হাওয়া দিতেই আগন্তুক হারানো জ্ঞান ফিরে পেল এবং আমার মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। ইংরেজীতেই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হঠাৎ শিষ্য-ভাইকে খুন করতে এলে কেন?'

আগন্তুক নিরুত্তর। আবার বললাম, 'তুমি এবং আমি যে একই, অর্থাৎ যোগেশ মহারাজের শিষ্য, একথা কি তোমার মনে পড়ছে না?

কথার জবাব দাও, তা না হলে তোমাকে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।'

আগন্তুক বলল, 'আমাকে তুমি ভুল বুঝছ। আমি যোগেশ মহারাজের শিষ্য নই।'

'কিন্তু আজ সকালেই যে তোমাকে রাজার ঘাটে যোগেশ মহারাজের কাছে দেখলাম।'

'ঠিকই দেখেছ। তবু আমি তাঁর শিষ্য নই।'

'তাহলে তাঁর কাছে গিয়েছিলে কেন?'

'কাজ ছিল।'

'কী কাজ?'

'বলব না।'

'আমাকে বলতেই হবে, নচেৎ তোমাকে পুলিসের হাতে তুলে দেব।'

পুলিসের নাম করতেই কাজ হল। সে বলল, 'আসলে আমি হিপি নই। হিপিদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কও নেই। তবে হিপিদের বিষয় আমার জানার খুব কৌতূহল। তাই যোগেশ মহারাজের কাছে মাঝে মাঝে যাই।'

'তুমি থাক কোথায়?'

'ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে।'

'কী কাজ কর?'

'ফুটের ওপর একটা বুক-স্টল আছে।'

'আমাকে খুন করতে এলে কেন?'

'আমার মনে হয়েছিল, তুমি পুলিসের লোক। আমার পেছনে লেগে আছ।'

'মনে হওয়ার কারণ?'

'আগেই বলেছি, ফুটের ওপর আমার একটা বুক-স্টল আছে। সেখানে বইয়ের সঙ্গে চোরাই জিনিসও বিক্রি হয়। তুমি হয়তো তা জানতে পেরেছ।'

'আমাকে কোনোদিন ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে দেখেছ ?'

'দেখেছি। তুমি আমার কাছ থেকে গত মাসে অনেক বই আর কিছু চোরাই জিনিস কিনেছ। আর কথা দিয়েছ প্রতি মাসে এক হাজার টাকার বই আর চোরাই জিনিস কিনবে।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'তোমারই নাম চাইল্ড লং-ফেলো তো ?'

'আমার নাম থাক, তোমার নামটা বল।'

'অলিভার যোসেফ'

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, 'আমার নাম জন লংফেলো, আমি কালিফোর্নিয়ার অধিবাসী। চাইল্ড লংফেলো আমার ভাই। বহু দিন যাবৎ নিরুদ্দেশ। শুনেছি সে ইণ্ডিয়াতে আছে। আমি তারই খোঁজে এখানে এসেছি। কাজেই তুমি আমাকে ভুল ভেবেছ। যাই হোক, চাইল্ডকে খোঁজার কাজে তুমি যদি আমাকে সাহায্য কর, উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব। আর পুলিসের হাতেও তোমাকে দেব না। অবশ্য চোরাই জিনিস বিক্রি করা বন্ধ করতে হবে। আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখ।

যোসেফ কয়েক মিনিট গুম হয়ে বসে রইল। আমি ইশারা করতেই বীর সিং বাইরে চলে গেল। অবশেষে যোসেফ বলল, 'আমি পারিশ্রমিক ছাড়া তোমার কাজে সাহায্য করতে রাজী আছি। কিন্তু ব্যবসা বন্ধ করতে পারব না। তা হলে উপবাসে মরতে হবে।'

'তোমাকে কেবল চোরাই জিনিস বিক্রি করা বন্ধ করতে বলেছি।'

'ওটাই তো আমার ব্যবসা।'

'অন্য ব্যবসা করবে, আমি সাহায্য করব। বুঝেছ ?

'এখন আমাকে কী করতে হবে ?'

'এখন বাড়ি চলে যাও। সামনের মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় তুমি আমার এখানে চলে আসবে। তখন তোমায় কাজ বলে দেব।'

আমি বীর সিংকে ডেকে তার গাড়িতে করে যোসেফকে ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে পৌঁছে দিতে বললাম।

নিশুতি রাত। থমথম করছে চারদিক। মাঝে মাঝে দু-একটা বেওয়ারিস কুকুরের ডাক এবং পাহারাওলার লাঠির আওয়াজ নিস্তব্ধতাকে ভেঙে খান খান করে দিচ্ছে।

আমি নিঃশব্দে নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাজার ঘাটে উপস্থিত হলাম। সেখানে এক অলৌকিক দৃশ্য আমার জন্য উন্মোচিত হয়েছিল।

আজ মঙ্গলবার, পয়লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২। আকাশটা মেঘলা থাকায় শীত নেই। যেন বসন্ত এসে গেছে।

হিপিরা সবাই শুয়ে আছে। কেবলমাত্র যোগেশ মহারাজ জাগ্রত অবস্থায় আসন করে বসে আছেন।

আমাকে দেখেই যোগেশ বললেন, 'এস জন, আমার সামনে বস।'

আমি বসলাম। কোন কথা বললাম না। ইনি আমার 'জন' নামটি মনে রেখেছেন দেখে কেবল বিস্মিত হলাম।

'তোমাকে আজ দীক্ষা দেব বলেছিলাম। এখন যা বলি, মন দিয়ে শোন। কারণ, এটাই হচ্ছে তোমার দীক্ষা-মন্ত্র। এক নম্বর—বাঁধাধরাভাবে কোথাও বাস করবে না, দু' নম্বর—অন্য লোকের ক্ষতি না করে কিংবা দেশের আইন ভঙ্গ না করে যা খুশি করতে পার, আর তিন নম্বর হল—নিজে শান্তিতে থাকবে এবং অপরকেও শান্তিতে থাকতে সাহায্য করবে।—এই হল দীক্ষা।'

আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম এবং মাঝে মাঝে তাঁকে দর্শন করার ইচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলাম।

আমার বাসায় তখন অলিভার যোসেফ এবং বীর সিং অপেক্ষা করছিল। কারণ, আজ ভোরেই আমাদের রানাঘাটে রওনা হওয়ার কথা।

রানাঘাট পৌঁছতে সকাল ছ'টা বেজে গেল। স্টেশনের কাছে গাড়িটা পার্ক করে রেখে আমরা তিনজনে হরিদাস পালের মিষ্টির দোকানে এসে বসলাম। এখানকার পানতোয়া বিশ্ব-বিখ্যাত।

কিন্তু সেই সকালে বেশী খাওয়া গেল না, তবু মাথা পিছু দু-টাকা করে বিল উঠল, চায়ের দাম স্বতন্ত্র।

কথা প্রসঙ্গে দোকানের এক খদ্দেরের কাছ থেকে জেনে নিলাম, কোথায় হিপিদের অবস্থান।

চাঁদিনীর ঘাট। ঘাটের সামনে বিরাট মাঠ। মাঠের পশ্চিমে পালচৌধুরীদের ঐতিহাসিক বাড়ি। বাড়ির অধিকাংশটাই এখন পোড়ো। ধ্বসে গেছে ব্যাপক অংশ। খানিকটা মেরামত করে রাখা হয়েছে, যেখানে আছে পূজামণ্ডপ।

মাঠে বসে মেলা, বারো মাসে তেরো পার্বণ উপলক্ষে। এখানকার বিখ্যাত মেলা হল বিজয়া এবং রথের মেলা। দুর্গা-প্রতিমা বিসর্জনের দিনে যে মেলা বসে, সেটাই হল 'বিজয়া'। নববর্ষের দিনে গোষ্ঠ-বিহারের মেলাও খুব জাঁকজমকপূর্ণ হয়। এছাড়া চড়ক, ঝুলন প্রভৃতিও আছে।

চাঁদিনীর ঘাটটি অবশ্য বছরে একবার আলোকমালায় সজ্জিত হয়, আর তা হয় বিজয়ার রাতে। কিন্তু বছরের সব সময়েই ঘাটটি সরগরম থাকে। প্রথমতঃ এটি খেয়া পারাপারের একটি প্রধান ঘাট, দ্বিতীয়তঃ ঘাটটির সামনে প্রশস্ত চর থাকায় এটি অবসর বিনোদনের স্থান (পার্ক) হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এই ঘাটেই বসেছে হিপিদের আড্ডা।

আমরা এই ঘাটের পারে এসে বসলাম। হিপিদের নৌকোটি আমাদের কাছ থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে।

একটি বৃহৎ আকারের ছই-দেওয়া বজরা নৌকো। পিছনে গলুইয়ের ওপরে দু'জন হিন্দুস্থানী মাঝি বসে আছে। ছইয়ের ওপরে বসে আছে কয়েকজন হিপি। ওরা রোদ পোয়াচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ধূমপানও করছে। কারণ, একটি ছোটো কলকে মাঝে মাঝে হাত বদল হয়ে বৃত্তাকারে ঘুরছে।

এখানে আসার পরিশ্রম যে অন্ততঃ আংশিকভাবেও (এখন পর্যন্ত) সার্থক হয়েছে, এটা ভেবে খুবই আশান্বিত হলাম।

আমার সঙ্গে দু-একজন হিপির চোখাচোখি হল। ওরা আমাদের দেখে সম্ভবতঃ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে।

একজন তরুণ হিপি নৌকো থেকে নেমে এল আমাদের কাছে। হেসে ইংরেজীতে বলল, 'গুড মর্নিং, মিস্টার...আমার নাম রিচার্ড ভোলানাথ... ।'

প্রত্যুত্তরে আমি বললাম, 'গুড মর্নিং, মিস্টার ভোলানাথ। আমার নাম জন লংফেলো, নিবাস কালিফোর্নিয়া। ইনি হলেন মিস্টার অলিভার যোসেফ ক্যালকাটায় ফ্রি-স্কুল স্ট্রীটে এঁর বইয়ের দোকান আছে। আর ইনি হলেন সর্দার বীর সিং, আমার ইণ্ডিয়ান ফ্রেণ্ড।'

ভোলানাথ বলল, 'আমি কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি।' এই বলে সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

জবাব দিল অলিভার, 'আমরা এসেছি চাইল্ড লংফেলোর খোঁজে। মিস্টার জন হচ্ছেন তাঁর এল্ডার ব্রাদার।'

'হতে পারে এল্ডার ব্রাদার। কিন্তু আমাদের হিপি সমাজে রক্তের সম্পর্ক অবান্তর। তাছাড়া চাইল্ড সকালবেলা কারোর সাথে দেখা করে না। আপনারা রাত্রিবেলা, মানে এগারোটার পর আসবেন। অন্য কোনো প্রয়োজন থাকলে আমাকে বলতে পারেন।'

আমি বললাম, 'না, আর কোনো দরকার নেই। ধন্যবাদ। আমরা রাত্রিবেলাতেই আসব। বিদায় এখনকার মত।' এই বলে আমরা উঠে পড়লাম।

লোক মারফত সারাদিন নৌকোটির ওপর নজর রেখেছিলাম। রাত আটটা পর্যন্ত সব ঠিকঠাকই ছিল। আটটায় আমাদের কাছে খবর পৌঁছে দিয়ে লোকটি ঘাটে গিয়ে দেখে নৌকো, নেই, কোনো হিপিরও পাত্তা নেই।

কিন্তু নৌকোটা গেল কোন্ দিকে? এখন ভাঁটা। উজানে একটা বজরা নৌকো চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যে-সে কথা নয়। তার ওপর বীর সিং নৌকোসহ যে পাঁচজন মাঝিকে ঠিক করেছিল তারা

চাঁদিনী ঘাটের উত্তরে (উজানের দিকে) একটি বাঁকের পরেই সব সময় নৌকোয় বসে আছে। যদি হিপিদের নৌকোটিকে ওদিকে যেতে দেখে থাকে, তাহলে নিশ্চয়ই খবর দিতে আসবে, কারণ সেরকমই কথাবার্তা হয়েছে।

ঘাট থেকে বড়বাজারে আমাদের এই ঠিকে বাসায় যাতায়াতে বড়ো জোর দশ মিনিট সময় লাগে। এরই মধ্যে বজরাটি ছেড়ে গেছে। বীর সিংকে আমাদের নৌকোটিকে চাঁদিনীর ঘাটে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে আমি এবং অলিভার এগিয়ে গেলাম ঘাটের দিকে। যে লোকটির ওপর ভার দেওয়া ছিল নৌকোটির ওপর নজর রাখার, সেও আমাদের সাথে চলল।

বীর সিং যে নৌকোটি ভাড়া করেছিল, সেটি একটি ডিঙি নৌকো। আমরা ঘাটে পৌঁছনোর মিনিট পাঁচেক পরেই নৌকোটি এসে ঘাটে লাগল।

কোন্ দিকে যেতে হবে, আমি আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সবাই একমত হয়ে ভাঁটার টানে নৌকো ছেড়ে দেওয়া হল। বৈঠা ঝপ ঝপ করে পড়তে লাগল জলে। নৌকো ছুটে চলল তীর বেগে, দক্ষিণ মুখে।

দেখতে দেখতে আমরা ছোটোবাজার-ঘাট, রিভার ব্রিজ, রাজদ্বার-শ্মশান-ঘাট, সাহেববাগান পার হয়ে আম্‌লিয়ার বাঁকে চলে এলাম। কিন্তু হিপিদের বজরার কোনো পাত্তা পেলাম না।

বীর সিং-এর হাতে ছিল একটি পাঁচ-ব্যাটারি টর্চ। সার্চ লাইটের মত তার আলো পড়তে লাগল দূরে কালো জলের ওপর, তীরবর্তী গাছপালার ওপর।

নদীর পাশাপাশি যদি পাকা রাস্তা থাকত, তাহলে গাড়িটি আনা যেত। বাধ্য হয়ে সেটি রানাঘাট থানায় রেখে আসতে হয়েছে। থানার বড়বাবু গোপাল দাস আমাদের সঙ্গে দু-একজন কনস্টেবল দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাতে রাজী হইনি, কারণ বীর সিং-এর ওপর আমার যথেষ্ট ভরসা আছে। তাছাড়া আগ্নেয়াস্ত্র তো সঙ্গেই আছে।

আমুলিয়ার বাঁকটা পার হতেই ডান হাতে, অর্থাৎ চূর্ণির পশ্চিম পাড়ে একটি ছায়াঘন অতিবৃদ্ধ বটবৃক্ষ। টর্চের আলোয় দেখা গেল বটগাছের নীচে হিপিদের নৌকোটি ভেড়ানো আছে।

আমি বীর সিংকে টর্চ জ্বালতে বারণ করে দিলাম এবং মাঝিদের নির্দেশ দিলাম আমাদের ডিঙিটি বজরার পাশে ভিড়াতে।

আমাদের সাড়া পেয়ে হিপিদের নৌকোর কেউ একজন হুইসিল বাজাল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটি টর্চের তীব্র আলো এসে আমাদের ওপর পড়ল।

আমি ইংরেজীতে চেঁচিয়ে বললাম, 'ভয় নেই, আমরা পুলিসের লোক নই। আমাদের সম্পর্কে তোমরা সম্পূর্ণ নির্ভাবনায় থাকতে পার।'

বজরার ওপর থেকে একটা বাজখাঁই গলা ভেসে এল, 'তোমরা কারা?'

'আমরা সাধারণ মানুষ। আমার নাম জন লংফেলো। আমি কালিফোর্নিয়ার অধিবাসী। আমি আমার ভাই চাইল্ড লংফেলোর সাথে দেখা করতে চাই। আমি বহুদূর থেকে আসছি। আমাকে নিরাশ' ক'র না।'

'আচ্ছা, এস।'

আমি, অলিভার যোসেফ এবং বীর সিং বজরায় উঠে এলাম। একটি লোক ইঙ্গিতে আমাদের ভিতরে যেতে বলল। আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম।

বজরার ভিতরটা একটি অখণ্ড শয্যা। সারি সারি শোয়ার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এখন সবাই উঠে বসে আছে। মাঝখানে একটি হ্যাজাগ জ্বলছে।

চাইল্ড লংফেলোকে চিনতে কোনো অসুবিধা হল না। ফটো দেখে দেখে তার মুখের গঠনটা প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। সে আমাদের তিনজনের মুখগুলো এক নজর দেখে নিয়ে বলল, 'অলিভার যোসেফ যে পুলিসের লোক, এটা আমার জানা ছিল না। তবে এটা

'আন্দাজ করেছিলাম, পুলিস আমার জাত-ভাইয়ের ছদ্মবেশেই হানা দেবে। আপনার মেকআপটা যাত্রা-পালার পক্ষে মন্দ হয়নি স্যার।' —এই বলে সে আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকাল।

আমি নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললাম, 'আমাকে তুমি চিনতে পারছ না, চাইল্ড। আমি তোমার দাদা, জন। বাবা এবং মা তোমার জন্য বড়ই দুশ্চিন্তায় আছেন। তোমার খোঁজ করতে তাঁরাই আমাকে ইণ্ডিয়াতে পাঠিয়েছেন।'

'চমৎকার, চমৎকার অভিনয়!' চাইল্ড হাততালি দিয়ে উঠল। পরক্ষণেই একটি রিভলভার বার করে আমার মাথার দিকে তাক করে ধরে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'তোমার আসল পরিচয় বল। নইলে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব। বল।···এক···দুই···'

বীর সিং অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল। চোখের ইশারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলাম, 'উইলসন উডরো।'

'কোথায় দেশ?'

'আমেরিকায়।'

'আমার পিছনে লেগেছ কেন?'

'দলে ভেড়ার জন্য।'

চাইল্ড অন্যমনস্ক হতেই আমি খপ করে তার হাত থেকে রিভলভারটা কেড়ে নিলাম এবং তার দলবলকে উপরে হাত তুলতে বললাম।

বীর সিং সকলের বডি সার্চ করে অস্ত্রশস্ত্র বার করে নিল এবং পকেট থেকে তার নিজের পিস্তলটি বার করে ওদের দিকে ঘোরাতে লাগল।

আমি চাইল্ডের চোখে চোখ রেখে বললাম, 'চোরাই জিনিসপত্র কোথায় রেখেছ?'

'চোরাই জিনিস!'

'হ্যাঁ, চোরাই জিনিস। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, প্রায় দেড় কোটি টাকার চোরাই সোনা তোমার নৌকোয় আছে।'

'মিথ্যে কথা।'

'মিথ্যে কথা! বীর সিং, নৌকোর গলুইতে যে শিকলটি বাঁধা আছে, সেটা জল থেকে তোলো।'

চাইল্ড এবং তার দলবল চঞ্চল হয়ে উঠল। বীর সিং একটি প্রকাণ্ড নোঙর টেনে তুলল।

যোসেফ অলিভার অবাক হয়ে আমার কাজকর্ম দেখছিল। লোহার নোঙরটি অতি কষ্টে টেনে তুলে বীর সিং বেশ হতাশ হয়ে পড়ল।

নৌকোটি ভাঁটার টানে দক্ষিণ মুখে ভেসে চলল।

চাইল্ড অনেকটা বিজয়ীর ভঙ্গিতে কাষ্ঠহাসি হেসে বলল, 'মিস্টার উডরো কি এর পরেও বলবেন যে, আমার নৌকোয় চোরাই সোনা আছে?'

'হ্যাঁ বলব। কারণ, এই নোঙরটি দেখে যদিও মনে হয় লোহা দিয়ে তৈরী, আসলে এটি নিরেট সোনার, এর ওপরে কেবল লোহার পাত পরানো আছে। বীর সিং, একটা লোহার রড দিয়ে নোঙরটার ওপর একটা বাড়ি দিয়ে দেখ তো!'

বীর সিং বাড়ি দিতেই লোহার পাত খানিকটা খসে গেল এবং ভিতরের সোনা হ্যাজাকের আলোয় ঝলসে উঠল। চাইল্ডের মুখটা মুহূর্তের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে সভয়ে বলে উঠলো, 'আপনি কে?'

'আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ গণেশ হালদার।'

'কোনোদিন আপনার নাম শুনিনি। যাই হোক, আপনাকে আমি সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করব।'

'দুঃখের বিষয়, আপনাকে আমি সন্তুষ্ট করতে পারব না। বীর সিং, এঁদের সকলের হাতগুলো পিঠমোড়া করে বেঁধে ফেল। আমার ব্যাগে দড়ি আছে, আর চাকু তো এঁদের কাছেই পেয়েছ। নাও, চটপট সেরে ফেল। এখনই জোয়ার এসে পড়বে। স্নানাঘাটে পৌঁছাতে বড় জোর আধঘণ্টা সময় লাগবে।'

তিনজন মাঝিকে আমার ভাড়া করা নৌকো থেকে উঠে এসে

এই নৌকোটাকে সামলাতে বললাম। দেখতে দেখতে জোয়ার এসে গেল। দুটো নৌকো পাশাপাশি ভেসে চলল -উত্তর মুখে। পূব দিকটা ক্রমশঃ ফরসা হয়ে উঠতে লাগল। পাখিদের কোরাস-সঙ্গীত আরম্ভ হয়ে গেল।

যোসেফ অলিভার আমাকে বলল, 'আপনি যে বাঙালী, এখনো তা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে।'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'চোরাই জিনিস বিক্রি করতে তোমার কষ্ট হয় না?'

'আমাকে একবার সুযোগ দিন, আমি আর ওসব বিক্রি করব না।'

'কিন্তু তোমাকে সমস্ত চোরাই জিনিস পুলিসের কাছে জমা দিতে হবে।'

'তথাস্তু।'

দুটো নৌকোই চাঁদিনীর ঘাটে এসে ভিড়ল। শিশু-সূর্যটা যেন সহসা হামাগুড়ি দিয়ে পূব আকাশের উঠোনে চলে এল।

'দেখুন কী আছে আমার হাতে।' ডান হাতের থাবাটা আমাদের সামনে মেলে ধরে বললেন মাদুলিবাবা।

আমরা পরিষ্কার দেখলাম মাদুলিবাবার ডান হাতে কিছুই নেই।

এবার তিনি বাঁ হাতটা দেখিয়ে বললেন, 'এ-হাতে? দেখুন, দুটো হাতই ভাল করে দেখুন। দেখেছেন? এবার বলুন, কিছু আছে আমার হাতে।'

উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সবাই একবাক্যে বলে উঠলো, 'না, কিছুই নেই।'

মাদুলিবাবা সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত মুঠো করে আমাদের সামনে আবার মেলে ধরলেন। তারপর বললেন, 'এবার?'

আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, তাঁর দু-হাতে দু-গাছি মুক্তোর মালা বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল ঝলমল করছে। আর মাদুলিবাবা আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে বিশ্ববিজয়ীর মতন মৃদু মৃদু হাসছেন।

এক সময় মাদুলিবাবা এক সাহেব-ভক্তের চোখের ওপর চোখ রাখলেন। বললেন, 'কী সাহেব, পরখ করে দেখতে চাও আসল মুক্তো কি না। এই নাও ধর।' বলেই তিনি হার দু-গাছি সাহেবের দিকে ছুঁড়ে দিলেন, আর সাহেব সঙ্গে সঙ্গে দু-হাতে লুফে নিল।

কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে সাহেব হার দু-গাছি মাদুলিবাবাকে ফিরিয়ে দিল। কিন্তু আমি বেশ ভালভাবেই লক্ষ্য করলাম তার চোখ থেকে এখনও অবিশ্বাসের ছায়া মুছে যায়নি। হয়তো আমারই চোখের ভুল হতে পারে, সাহেবদের নীল চোখের রহস্য হয়তো ধরতে পারিনি।

মাদুলিবাবা সাহেবকে বললেন, 'আরও দেখবে? এই দেখ,

আমার দুটো হাতই খালি। এই মুঠো করলাম। এই খুললাম। কী দেখছ এবার?'

না, এবার আর মুক্তোর হার নয়, তার চেয়েও দামী জিনিস। মাদুলিবাবার দু-হাতে দুটো আংটি। দুটো আংটির মাথাতেই দু-খণ্ড প্রকাণ্ড হীরে শোভা পাচ্ছে। আমি নিজে যদিও জহুরী নই, তবুও কেন জানি না, আমার কেবলই মনে হচ্ছে এত বড় বড় হীরে শুধু ভারতবর্ষেই নয়, পৃথিবীতেই বিরল দেখা যায়।

সাহেব হাত বাড়িয়ে দুটো আংটিই মাদুলিবাবার কাছ থেকে নিয়ে নিল। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলো।

মাদুলিবাবা আর সাহেবের দিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। একটু পরে অনেকটা আপনমনেই বলে উঠলেন, 'আমাকে পরীক্ষা করবে মানুষ! তাহলেই হয়েছে! আমি আপনাদের সামনে ঘোষণা করতে চাই, এক মাত্তর ভগবান ছাড়া আমাকে পরীক্ষা করার অধিকার আর কারও নেই।' বলেই তিনি একটু থামলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন, 'আপনারা আমাকে ভালবাসেন, ভক্তি করেন, এটাই তো আমার পাসের খবর। স্বয়ং ভগবানই তো আমার এই পরীক্ষা নিয়েছেন। এ কি যা তা পরীক্ষা! মানুষের হৃদয় জয় করা কি যার তার কর্ম। প্রেম বললেই কি প্রেম হয়!'

মাদুলিবাবা থামতেই সাহেব আংটি দুটো তাঁর হাতে ফিরিয়ে দিল। আর নিঃসংকোচে বললো, 'প্রেমের কথা রাখুন। আপনার অলৌকিক ক্ষমতার কথা বলুন।'

'নিজের চোখেই তো তা দেখলে।'

'যা দেখলাম, সে তো ম্যাজিক। ম্যাজিক তো লৌকিক ক্ষমতা।'

'ম্যাজিক মানে? দু-ছড়া মুক্তোর মালা আর দুটো হীরের আংটি কি ভুয়ো? তাহলে তুমি দেখলে কী?'

'ভুয়ো, সে-কথা বলিনি। বরং আমি বলতে চাই, ও-রকম বহু মূল্যবান্ অলংকার আপনার কাছে আরও আছে। আপনি কেবল

একটু জাদুবিদ্যার আশ্রয় নিয়ে আমাদের এতগুলো লোককে ভেলকি দেখিয়ে দিলেন। ভেবেছেন, এ-রকম করেই গণেশ হালদারের চোখে ধুলো দিতে পারবেন।'

কে! গণেশ হালদার! প্রাইভেট ইনভেসটিগেটর গণেশ হালদার! তাহলে লোকটা সাহেব নয়, সাহেবের ছদ্মবেশ পরেছে কেবল।

শুধু মাত্তর 'গণেশ হালদার' নামটা উচ্চারণ হতেই ঘরের আবহাওয়া যেন পাল্টে গেল। সবাই সাহেববেশী গণেশ হালদারের দিকে অবাক হয়ে তাকাতে লাগলাম।

কিন্তু মাদুলিবাবা দমলেন না। তিনি সরোষে বলে উঠলেন, 'আমি কারোর চোখে ধুলো দিতে চাই না। বরং সবার চোখের সামনে প্রমাণ করতে চাই যে, আমি ম্যাজিসিয়ান নই, মাদুলিবাবা। আবার বলছি, আমার ক্ষমতা পরীক্ষা করার অধিকার ভগবান ছাড়া কারও নেই।'

গণেশ হালদার বললো, 'আপনি অনর্থক রেগে যাচ্ছেন। কথা হচ্ছে আপনার আর আমার মধ্যে। এখানে আবার মিস্টার ভগবানকে টেনে আনছেন কেন? আপনি বরং আপনার মাদুলির গল্প আরম্ভ করুন, আমরা শুনি।'

মাদুলিবাবার গলায় কয়েকগাছি মাদুলির মালা। বেশ বড় বড় মাদুলি। সংখ্যায় কম করেও শ' পাঁচেক।

'তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছ? জান, টালিগঞ্জ থানার ও-সি আমার পরম ভক্ত? আমার এই মাদুলি শরীরে ধারণ করে কত লোক রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে, সে খবর রাখ?'

সব খবরই আমি পেয়েছি। আপনার মাদুলি-রহস্যও আমার জানা হয়ে গেছে। এখন সেই জানা রহস্যটাই আমি উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর সামনে উদ্ঘাটন করে দেব। তবে একটু অপেক্ষা করতে হবে। একটু আগে আপনি যে পুলিস অফিসারের নাম করলেন, তিনি আর মিনিট দশেকের মধ্যেই এসে যাবেন। তাঁর সঙ্গে সন্তোষ

বিশ্বাসেরও আসার কথা। সন্তোষ বিশ্বাসকে চেনেন তো?' বলেই গণেশ হালদার মাদুলিবাবার চোখের দিকে বাঁকা চোখে তাকালো।

স্পষ্ট দেখলাম, গণেশ হালদারের কথায় মাদুলিবাবা বেশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন, 'তোমার মতন নাস্তিক লোকের সঙ্গে তর্ক করার সময় আমার নেই। তুমি এখন যেতে পার। আমার খুব কাজ আছে।'

'কাজ আমারও আছে।'

'বটে!' বলেই অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন মাদুলিবাবা। তিনি পকেট থেকে আচমকা আগ্নেয়াস্ত্র বার করে ফেললেন।

গণেশ হালদার ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো, 'আমি এটাই চাইছিলাম। আপনারা সবাই মাদুলিবাবার স্বরূপখানা দেখছেন তো।'

'চোপ রও! যদি ভাল চাও, এখনি আমার আখড়া থেকে বেরিয়ে যাও। না হলে তোমার মাথার খুলি এই মুহূর্তে উড়িয়ে দেব।' উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলেন মাদুলিবাবা।

'যাব।' বলেই গণেশ হালদার চোখের পলকে ঝাঁপিয়ে পড়লো মাদুলিবাবার উপর।

গায়ের জোরে গণেশ হালদার শীগ্‌গিরই মাদুলিবাবাকে কাবু করে ফেললো। তাঁর হাত থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিল। ঠিক তখনই আমাদের সামনে উপস্থিত হলেন দু-জন বিশিষ্ট পুলিস অফিসার। একজন হচ্ছেন টালিগঞ্জ থানার ও. সি. বিনয় মজুমদার, অন্যজন হচ্ছেন গণেশ হালদারের ডিটেকটিভ জীবনের বে-সরকারী গুরু, ডি, সি, ডি, ডি, সন্তোষ বিশ্বাস।

গণেশ হালদার মাদুলিবাবাকে বললো, 'ওই যে আপনি যার কথা বলছিলেন, তিনি এসে গেছেন।' এই বলে সে বিনয় মজুমদারকে দেখালো। তারপর বললো, 'কি বিনয়বাবু, মাদুলিবাবাকে চেনেন নাকি? ভাল করে দেখুন তো এঁর বদনখানি।' বলেই সে মাদুলি-বাবার নকল দাড়ি হাত দিয়ে টেনে উপড়ে ফেললো।

'আরে, এ কে! জয়নগরের গোপাল চক্রবর্তী না!' বললেন বিনয়বাবু।

'এখনও আপনার সন্দেহ আছে? এই মহাত্মাটির নাম এক সময় সি. বি. আই-এর খাতায় উঠেছিল। স্মাগলার হিসেবে এঁর যথেষ্ট কুখ্যাতি আছে। কিন্তু সি. বি. আই. বা পুলিস কোথাও এঁর পাত্তা পাচ্ছিল না। নিজেরই অলৌকিক ক্ষমতা বলে আজ ইনি আমাদের কাছে ধরা দিলেন। না হলে আমাদের সাধ্য কী ছিল এঁর কেশাগ্রটুকুও স্পর্শ করি।' একটু থেমে সে আবার বললো, 'এই যে মাদুলির মালাগুলো দেখছেন, এগুলোতে ভরতি আছে সোনা।' সে মালাগুলো খুলে ও. সি-র হাতে দিল।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। মাদুলিবাবা ওরফে গোপাল চক্রবর্তী গ্রেফতার হলেন। আমরা (অর্থাৎ মাদুলিবাবার ভক্তবৃন্দ) যে যার বাড়িতে ফিরে এলাম। আর প্রতীক্ষায় রইলাম, কবে মাদুলিবাবার বিচার আরম্ভ হবে।

আমি অবাক হলাম না। কেননা সন্তোষদার মুখে এসব কথা আগেই শুনেছি। তবে একটু অ'লাদা ভাষায়, আলাদা সুরে, শুধু এইটুকুই যা তফাৎ।

মাকসুদ সাহেব একটানা কথাগুলো বলে আমার মুখের দিকে তাকালেন। চোখের পলক না ফেলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়েই রইলেন। এবার বুঝি তাঁরই অবাক হওয়ার পালা। বললেন, 'বিশ্বাস হলো না! এ-বাড়ির নিচে ওয়াটার ফ্লো আছে কি না দেখবেন?'

সম্ভবত আমার মুখের অবয়বে কোনো ভাবান্তর রেখা ফুটে উঠতে না দেখেই মাকসুদ সাহেব আমার বিশ্বাস সম্বন্ধে এরকম উল্টো সিদ্ধান্ত টানলেন। তা টানুন, এতে বরং আমার ভালই হলো। 'সনৎ' ঝর্নার গুপ্ত রহস্যটা এখনি ভেদ করা না গেলেও অন্তত ওপর থেকে দেখা যাবে। আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'দেখার সুযোগ পেলে অবশ্যই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করবো।'

তিনি হাসির সঙ্গে একটু কৌতুক মিশিয়ে বললেন, 'আপনারা লেখক মানুষ, জন্ম থেকেই তো ভাগ্যবান। আমাদের মতন অভাগারা আপনাদের খোরাক যোগাতে পারলেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করে। আসুন আমার সঙ্গে—এক্সকিউজ মি, দু-তিন মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। রহিমের কাছে নিচের সিঁড়ির চাবিটা আছে। ও কোথায় আছে আগে দেখি।' বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রহিম আবার কোথায় থাকবে। ওই তো উত্তরদিকের ছোট্ট টিলাটার ওপর বসে বৎস গান গাইছে। এখান থেকে জানালা দিয়ে তো স্পষ্টই ওকে দেখা যাচ্ছে। উত্তুরে বাতাসে ওর গানের সুরও একরকম স্পষ্টই ভেসে আসছে। না, গান না, আবৃত্তি করছে রহিম। টানগুলো একটু বেশি হয়ে যাওয়াতে এখান থেকে গান বলেই মনে

হচ্ছে। সে যাই হোক, মাকসুদ সাহেব কি ওকে দেখতে পাননি! না কি অন্য কোনো মতলব আছে তাঁর!

এক মিনিট—দু' মিনিট—তিন মিনিট—চার মিনিট কেটে গেল, অথচ মাকসুদ সাহেবের ডাক এসে পৌঁছালো না। ওদিকে রহিমের কাছেও তাঁকে যেতে দেখা গেল না। রহিম একইভাবে বসে তখনও আবৃত্তি করে চলেছে। তাহলে কি ও রহিম না! রহিমের মতন দেখতে অন্য কেউ! কে হতে পাবে! ইলতাফ হোসেন!

ইলতাফ হোসেনের নাম শুনেছি, এখনো চোখে দেখিনি। সে হচ্ছে আবুল মাকসুদের চাচাতো ভাই। গতকাল কথাপ্রসঙ্গে মাকসুদ সাহেব তার কথা বলেছিলেন বটে। ছেলেটির নাকি পড়াশুনোর দিকে অসম্ভব ঝোঁক। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম. এ. পাস করে ওখানেই নাকি কোনো কলেজে প্রফেসারি করে। এখন শিমুলতলায় এসেছে বহুদিনের ছুটি কাটাতে। ব্যবসার দিকে একদম মন নেই। এসব একা মাকসুদ সাহেবকেই সামলাতে হয়। তিনি একেবারে হিসসিম খেয়ে যাচ্ছেন।

শিমুলতলার আবুল মাকসুদকে এক ডাকে সবাই চেনে। প্রথমত তিনিই এখানকার একমাত্তর সম্ভ্রান্ত মুসলমান। দ্বিতীয়ত, তিনি একজন পয়সাওয়ালা ব্যবসাদারও। ভারতের বড় বড় শহবে তিনি কেন্দু পাতা সাপ্লাই দেন। এজন্য অনেকগুলো বাগান তাঁর লীজ নেওয়া আছে। গতকাল ট্রেন থেকে নেমে প্রথমেই তাঁর আড়তে গিয়েছিলাম। স্টেশনের খুব কাছেই তাঁর আড়ত—বিরাট কারবার।

'সাহেব আপনাকে সিঁড়ির ঘরে যেতে বললেন। আসুন আমার সঙ্গে।' স্বয়ং রহিম আমাকে ডাকতে এসেছে।

রহিমের ডাকে হুঁশ পেয়ে উত্তরের জানালা দিয়ে টিলাটার দিকে তাকাই। আশ্চর্য, কেউ তো নেই ওখানে!

আমি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে রহিমকে জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা, তুমি কি আবৃত্তি জানো?'

রহিম লাজুক হেসে বললো, 'ছোটবেলায় করতাম। ইস্কুলে দু-তিনবার প্রাইজও পেয়েছিলাম। এখন প্র্যাকটিস নেই।'

ওর উচ্চারণ-ভঙ্গিমা বড় সুন্দর। অবশ্য ওর সবকিছুই সুন্দর। এরকম ছেলের উচিত হচ্ছে যাত্রাদলে হিরোর পার্ট নেওয়া। চাকরের কাজ ওর সাজে না।

আমি আবার বললাম, 'হোসেন সাহেবকে দেখছি না তো?

'তাকে তো এখন দেখতে পাবেন না, তিনি তো সেই ভোর থাকতেই চলে গেছেন ছাতি-পাহাড়ে।'

আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না। কথা বলতে বলতে সিঁড়ির ঘরে চলে এসেছি। এখানে মাকসুদ সাহেব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

সিঁড়িটা ধাপে ধাপে নেমে গেছে নিচের দিকে। চড়া পাওয়ারের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। আগে ভেবেছিলাম, সিঁড়িটা বুঝি অন্ধকার হবে, টর্চ না নিলে নিচে নামা যাবে না। (এ রকম ভাবনা বোকামির নমুনা ছাড়া আর কী! কেননা, এটা তো কোনো পড়ো-বাড়ি কিংবা রূপকথার দৈত্য-বাড়ির সিঁড়ি না!...সন্তোষদা শুনলে নিশ্চয়ই খুব জোরে হেসে উঠতেন। বলতেন, 'এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি ডিটেকটিভগিরি করতে এসেছ?')

স্টেপ গোনা আমার পুরোনো অভ্যাস। সচরাচর একতলা থেকে দোতলায় উঠতে যে-ক'টা স্টেপ পাওয়া যায়, এখানেও তাই। মোট কুড়িটা স্টেপ নেমে এসেই আমরা আণ্ডার-গ্রাউণ্ডের মেঝেতে এসে দাঁড়ালাম।

এটা বেশ বড় সাইজের একটা ঘর। ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে আরও ঘর আছে। দরোজাগুলো দেখা যাচ্ছে। তবে সবগুলোতেই বড় বড় তালা ঝোলানো।

মাকসুদ সাহেব বললেন, 'এই বাড়িটা তৈরি করেছিলেন রানাঘাটের জমিদার মিলন দে চৌধুরী। এখন থেকে পাকা একশ' বছর আগে। ভদ্রলোক কবি ছিলেন। তখনকার দিনের ম্যাগাজিন-

গুলো খুঁজলেই তাঁর দু চারটে কবিতা পাওয়া যাবে। জানি না তাঁর কোনো কবিতার বই আছে কি না। শেষ জীবনে কবি হওয়ার চেয়ে ফিল্মের ডিরেক্টর হওয়ার দিকেই তাঁর ঝোঁক বেড়ে গেল। এখানে তিনি স্টুডিও খুললেন। অবশ্য আরও একজন নামকরা লোক এখানে স্টুডিও খুলেছিলেন। আর এই কারণেই শিমুলতলায় বাংলা ফিল্মের দাদা-দিদিদের আনাগোনা শুরু হয়েছিল। শখের বাঙালী বাবুদের সেই থেকে এখানে বাড়ি করারও হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এখানে যত বাড়ি দেখবেন, তার বেশির ভাগেরই মালিক হচ্ছে বাঙালী।'

আমরা পায়ে পায়ে ডানদিকের একটি দরোজাব সামনে এসে দাঁড়ালাম। নাইন-লিভার গোডরেজ তালাটা চাবি ঘুরিয়ে খুলে ফেললো রহিম। পাল্লা-দুটোর ওপর অল্প একটু হাতের চাপ দিতেই সে-দুটো ফাঁক হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক রকমের পচা-ভ্যাপসা গন্ধ এদিকে বেরিয়ে এলো। রহিম ভেতরে ঢুকেই সুইচ টিপে আলো জ্বাললো।

মাকসুদ সাহেব আবার বলে চললেন, 'আসলে কোনো বাঙালীবাবু এখানে বারো মাস থাকেন না। এখানে সিজন-টাইমে আসেন ফুর্তি করতে। কেউবা স্বাস্থ্য ফেরাতে। আবার কেউ কেবল ট্যুর করতে। যেমন, আপনি এসেছেন।' একটু থেমে তিনি আবার বললেন, 'যা বলছিলাম—মিলনবাবুর ছিল খেয়ালী মন। একবার তাঁর খেয়াল হলো, ছ'মাস পাতালে বাস করবেন। এ-সময় তিনি তাঁর চাকর ভিখন সিং ছাড়া আর কারও মুখ দেখবেন না। এই উদ্দেশ্যেই পাশ থেকে পাথর কেটে তৈরি করা হলো এই আণ্ডার গ্রাউণ্ড ফ্লোর। আর তখনই ওয়াটার ফ্লোটি মিলনবাবুর নজরে আসে। আসলে এটা আবিষ্কার করে রাজমিস্ত্রীরাই। এই দেখুন সেই ঝর্না-ধারা।' বলেই তিনি একটি সুইচের ওপর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে চাপ দিলেন, আর অমনি আমাদের সামনের আধখানা মেঝে আস্তে আস্তে সরে গিয়ে ওদিকের দেওয়ালের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি বলতে ভুলে গেছি. ঘবটার মাঝ-বরাবর একটা মজবুত লোহার রেলিং

ছু-পাশের দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা রয়েছে। এই রেলিঙের ওপাশের মেঝেটা সরে যেতেই দেখতে পেলাম একটি গহ্বর। ছল-ছল ছলাৎ-ছলাৎ আওয়াজও শুনতে পেলাম। ঠিক বলা হলো না, অনেকটা যেন—অনেকটা যেন বেতালা ঢোল বাজনার মতন এই আওয়াজ। হয়তো আবদ্ধ জায়গায় বলেই আওয়াজটা এমন গম্ভীর শোনাচ্ছে।

আমরা রেলিং ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে নিচে তাকালাম। নিচেতেও আলো পড়েছে। পেঁজা তুলোর মতন সাদা-ফেনিল জলের গতি সত্যিই চোখে পড়লো।

আমি মাকসুদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এখানে 'সনৎ' ঝর্নার ডেপ্‌থ্‌ কতটা?'

'একুশ ফুট।' তিনি জবাব দিলেন।

'এত!'

'হ্যাঁ, আমি নিজে মেপে দেখেছি। দাঁড়ান, আর একবার মাপা যাক। রহিম, চেনটা নামাও তো।'

রেলিঙে জড়ানো ছিল একটা মোটা লোহার শেকল। সেটা খুলে রহিম নিচে নামাতে লাগলো।

এখানে জলের গভীরতা সত্যিই একুশ ফুট। এটা যদি প্রাকৃতিক হয়, সত্যিই অস্বাভাবিক। কারণ 'সনৎ' নিতান্তই 'নগণ্য' ঝর্না। 'সনৎ' নামক কোনো এক মহাশয় ব্যক্তি এটি প্রথম আবিষ্কার করেন, আর এরই পাশে তৈরি করেন নিজস্ব বাগানবাড়ি। সম্ভবত নিজের নাম অনুসারে তিনিই এই ঝর্নাটির নামকরণ করেন 'সনৎ ঝর্না'।

সনৎবাবুর ধারণা ছিল ঝর্নাটির উৎস-স্থানেই তিনি বাড়ি তৈরি করেছেন। তাঁর আমল থেকে এই ধারণাটি এখনো পর্যন্ত সরকারী-ভাবে চালু আছে।

আমি বললাম, 'আর কেউ এ খবরটা জানে?'

'জানতেন কেবল মিলনবাবু। মিস্ত্রীরাও জানতো। কিন্তু টাকা দিয়ে তিনি তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর বংশধর সুজনবাবু এ খবর পাননি। সুজনবাবুর ছেলে বিজনবাবু তো এ বাড়িতে

কোনোদিন পায়ের ধুলোই দিলেন না। তাঁর কাছ থেকেই আটবছর আগে এই বাড়িটা আমি কিনে নিই। আমি—মানে, আমি আর আমার ভাই ইলতাফ হোসেন। আমরাও অবশ্য এখানকার পুরানো লোক। আমাদের কেন্দু পাতার কারবার অনেক দিনের।'

'হোসেন সাহেব ঝর্নার খবর জানেন?'

'না। জীবিত মানুষের মধ্যে আমি ছাড়া জানে কেবল এই রহিম। আসলে রহিমই এটা নতুন করে আবিষ্কার করে। আর জানলেন আপনি। আমার ইচ্ছা, আপনি এ নিয়ে গল্প লিখুন। দশজনে পড়ুক। তাদের মুখ থেকে গল্পটা ছড়িয়ে যাক আরও এবশ' জনের মধ্যে।'

'তার মানে, আপনি এর পাবলিসিটি চাইছেন। তাহলে খবরের কাগজকে জানালেই হয়।'

'খবরের কাগজের কথাও ভেবেছিলাম। কিন্তু ওরা হচ্ছে—কী বলবো—হ্যাঁ, ওরা হচ্ছে বেরসিক। আমার দিকটা একবারও ভাববে না।'

'আপনার দিক?'

'বুঝলেন না, আমরা হচ্ছি মশাই ব্যবসাদার লোক, টাকা ছাড়া আর কোনো দিকের কথা ভাবিই না। আপনি যেভাবে রসিয়ে লিখবেন, কোনো রিপোর্টার কি সেভাবে পারবে? আপনার গল্প পড়ে পাঠক নিশ্চয়ই খবরটাকে মূল্য দেবে বেশি। তারা এখানে আসতে চাইবে। আর সেই সুযোগে আমিও চেষ্টা করবো কোনো একটা অ্যাকাউন্টে ডোনেশন নেওয়ার।'

মাকসুদ সাহেবের যুক্তিটা আমার কাছে কেমন যেন খেলো বলে মনে হলো। তিনি আমার সঙ্গে 'জোক' করছেন না তো!

'এই সুযোগে আর একটা খবর আপনাকে জানিয়ে রাখি,' তিনি বলে চললেন, 'মিলনবাবুর উইল অনুসারে তাঁর চিতাভস্ম এই ঝর্না-ধারায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

না, মাকসুদ সাহেবকে আর বিশ্বাস করা চলে না। এই কিছুক্ষণ

আগে তিনি বললেন, মিলনবাবুর বংশধরেরা বা অন্য কেউ ঝর্নার অস্তিত্বের খবর জানে না, তাহলে তাঁর চিতাভস্ম কে এখানে ভাসিয়ে দিল ?

হঠাৎ রহিমের চোখের ওপর আমার চোখ পড়ে গেল। চোখ দিয়ে কী যেন বলতে চাইছে সে। সন্তোষদা হলে নিশ্চয়ই ওর চোখের ভাষা বুঝতে পারতেন। কিন্তু আমি নির্বোধ, নেহাৎ পেটের দায়েই আমাকে ডিটেকটিভ-লাইনে নামতে হয়েছে। আমার পক্ষে রহিমের ভাষা বোঝা সম্ভব হলো না।

সহসা মাকসুদ সাহেবের দিকে ঘুরে রহিম বলে উঠলো, 'সাহেব, সিঁড়ির দরোজাটা আমরা খুলে রেখে এসেছি।'

'তাই তো !' মাকসুদ সাহেব চমকে উঠলেন।

আমরা আবার বসবার ঘরে ফিরে এলাম।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে পড়লাম। ঘুম এলো না। সন্তোষদার কথাগুলোই কেবল মনে আসতে লাগলো।

সন্তোষদা বলছি যাঁকে, তিনিই হচ্ছেন গোয়েন্দা-দপ্তরের বড়কর্তা সন্তোষ বিশ্বাস। অনেক ব্যাপারে আমি যেমন তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ, তেমনি তিনিও অনেক ব্যাপারে আমার সাহায্য নিয়েছেন। যেমন, এই ঝর্না-রহস্যের কথাই ধরুন না কেন।

এখানে এসেছি ভারতের একজন কুখ্যাত চোরা-চালানকারীকে পাকড়াও করতে। সে লোকটি যে আসলে কে, তা এখনও ধরতে পারিনি। আর সন্তোষদাও স্পষ্ট করে কিছু বলে দেননি।

আমি এই শিমুলতলায় এসেছি মাকসুদ সাহেবের অতিথি হিসেবে। অবশ্য প্রাইভেট ডিটেকটিভ গণেশ হালদারের পরিচয় নিয়ে এখানে আসিনি, এসেছি প্রখ্যাত রহস্য-রোমাঞ্চ লেখক 'ধূমকেতু'-র নাম নিয়ে। অর্থাৎ, আমি এখন আর গণেশ হালদার নই, আমি হচ্ছি 'ধূমকেতু' ওরফে সুধারঞ্জন দে।

'ধূমকেতু' নামটা প্রখ্যাত হলেও 'সুধারঞ্জন দে' একেবারেই অখ্যাত। ছদ্মনামের প্রভায় আসল নামটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। আর

আমি এই নিষ্প্রভ নামটাই দিব্যি এখানে চালিয়ে যাচ্ছি। এতে আমার অনেক সুবিধা হয়েছে। তার ওপর নামের আসল মালিকের কনসেন্ট তো আগে থেকেই নেওয়া আছে। এই মামলা যতদিন চলবে, তিনি ততদিন গা ঢাকা দিয়েই থাকবেন। বাহুল্য হলেও এই সুযোগে বলে নিই—ধূমকেতু মহাশয় এখন সশরীরে এই শিমুলতলাতেই রয়েছেন। তাঁর নাম এখন বিমলেন্দু ব্রহ্মচারী। তিনি এখানে হাওয়া পালটানোর নাম করে রহস্য-গল্পের প্লট খুঁজতে এসেছেন। এখন আছেন 'সুধাকুঞ্জে'।

যা বলছিলাম—এখানে এসেছি এক নটোরিয়াস স্মাগলারকে অ্যারেস্ট করতে। মানে, সন্তোষদাই হচ্ছেন সব, আমি কেবল নামকেওয়াস্তে গোয়েন্দা। আসলে আমাকে পুরোপুরি অন্ধকারের মধ্যেই ঠেলে দেওয়া হয়েছে। কেবল বলা হয়েছে, 'সনৎ' ঝর্নার রহস্যটা ধরতে পারলেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আজ সকালে মাকসুদ সাহেবের সঙ্গে ঝর্নার উৎসটা দেখে আসার পর থেকেই তিনটে প্রশ্ন আমাকে উত্যক্ত করে তুলছে: এক, ইলতাফ হোসেনের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না কেন? দুই, টিলার ওপর বসে তখন কে আবৃত্তি করছিল? তিন, মাকসুদ সাহেব মিথ্যে কথা বললেন কেন? আর যদি তিনি সত্যি কথাই বলে থাকেন, মিলনবাবুর চিতাভস্ম কে ওই ঝর্নাধারায় ফেলে দিয়েছিল? স্বয়ং মাকসুদ সাহেব, না রহিম? শেষের প্রশ্নটা থেকে নানারকম প্রশ্ন আমার মনে উঁকি মারছে। সবগুলো এক এক করে তামিল হরফে (তামিল ভাষায় নয়, বাংলাতেই) নোটবুকে লিখে ফেললাম। (এই টেকনিকটা আমি শিখেছি সন্তোষদার কাছ থেকে। এর সুবিধা হচ্ছে বাঙালীরা সাধারণত তামিল-হরফটা জানে না। আর লেখাটা তামিল ভাষাভাষীরা পড়তে পারলেও চট করে মানেটা বুঝে উঠতে পারবে না।)

বেলা গড়িয়ে চললো। তিনটের সময় রহিম চা নিয়ে এলো। সেই সময় বলে গেল আমি সেন সাহেবের মাছের চাষ দেখতে যাব কি না।

মাছের চাষ। তাও আবার শিমুলতলার মতন জায়গায়! আশ্চর্য তো! ওকে বললাম, 'তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?'

রহিম জানালো যে, মাকসুদ সাহেবের অনুমতি পেলে সে যেতে পারে। কিন্তু পরে আর ও অনুমতি পায়নি। মাকসুদ সাহেব ওকে মুরগীর খোঁজে পাঠালেন। তিনি অবশ্য নিজেই আমার সঙ্গে সেন সাহেবের কুঠীতে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যস্ত মানুষ। তাঁকে আমি রিলিফ দিয়ে বললাম, 'ডিরেকসনটা বলে দিন, আমি নিজেই যাচ্ছি।'

তিনি বললেন, 'আপনাকে যেতে হবে পূবদিকে। লাট্টু পাহাড় ছাড়ালেই সেন সাহেবের কুঠী-বাড়ি। বাঁ হাতে পড়বে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'রহিমও হয়তো সেন সাহেবের কুঠী-বাড়ি চেনে না। মাত্তর দু' মাস হলো এখানে কাজে লেগেছে।'

লাট্টু পাহাড়ের যাত্রী অনেক। লাল মাটির কাঁচা রাস্তা ধরে সারি সারি এগিয়ে চলেছে সবাই।

পথের ধারেই একটা মিষ্টির দোকান। অনেক বাঙালীবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ল্যাংচা খাচ্ছেন। আগে শুনেছিলাম, যাঁরাই শিমুলতলায় আসেন, তাঁরাই এখানকার ল্যাংচা খেয়ে যান। এখানে ছানা সস্তা। আর সেই ছানার তৈরী এখানকার ল্যাংচা নাকি ভারতের যে-কোনো জায়গার চেয়ে সস্তা, আর সেই কারণে বিখ্যাত। রাণাঘাটের পানতোয়া (ল্যাংচার অপর নাম) নাকি এর তুলনায় নিছক 'রাঙালু'।

দোকানের দিকে একবার উঁকি মারতেই ধূমকেতুকে আবিষ্কার করে ফেললাম। তিনি বেশ পরিতৃপ্তির সঙ্গেই ল্যাংচা গিলছেন। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বাঁ হাতে ঠোঙাটা ধরে রেখে ডান হাত দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করলেন। তারপর কোনো রকমে মুখটা মুছে নিয়ে বলে উঠলেন, 'আরে হা—।'

আমি হাত দিয়ে ইশারা করতেই তিনি কিছুক্ষণ হাঁ করে রইলেন। তারপর এই বলে কথাটা শেষ করলেন : 'আরে হামার সুধাবাবু যে!'

বুদ্ধি আছে লোকটির। হাজার হলেও লেখক মানুষ তো! আমাদের মত কত চরিত্তির যে 'ছিষ্টি' করেছেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কম করেও এখন বাজারে তাঁর ষাট-সত্তরখানা বই আছে। আর একটু হলেই বলে ফেলেছিলেন 'আরে হালদারবাবু যে!' কিন্তু আমার ইশারা পেয়েই নিজের ভুলটা বুঝতে পেরেছেন, আর সামলেও নিয়েছেন। না হলে এত লোকের মাঝখানে আমার আসল নামটা জানাজানি হয়ে গেলে বিপদের একশেষ হতো।

বিপদ অবশ্য এমনিতেই আছে। গোয়েন্দার খাতায় যেদিন আমি নামটা লিখিয়েছি, সেদিন থেকেই নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছি। যে-কোনো দিন খুন হয়ে যেতে পারি। কেননা, আমি গণেশ হালদার হলেও মানুষ ডিটেকটিভ কিনা! (গল্পের বইয়ের ডিটেকটিভ হলে হয়তো আজীবন অমর হয়েই থাকতে পারতাম।)

আমার গণেশ হালদার নামটা বিচ্ছিরি হলেও খবরের কাগজের কল্যাণে আজকাল বেশ পপুলার হয়েছে। আমি নাকি খুন-বদমাশদের যম। কোনো মামলায় নাকি আমি আজ পর্যন্ত হার মানিনি! যত্ত সব—এদের কাজই হচ্ছে এই, যখন যাকে আপে তুলবে, তুলেই যাবে, আবার যাকে ডাউন করবে, তাকে যে কোথায় নামাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই! না হলে এরা আমার সম্বন্ধে যে এত বড় বড় কথা লেখে, কতটুকু আমার সম্বন্ধে জানে! ওরা কি জানে যে, আমার ব্যর্থতার ইতিহাস সাফল্যের ইতিহাসের চেয়ে অনেক বড়! ওরা কি জানে যে, সন্তোষদা না থাকলে আমি কোনো রহস্যেরই সমাধান করতে পারতাম না!

আমি রীতিমতন গাম্ভীর্যের সঙ্গেই ধূমকেতুকে বললাম, 'এই যাচ্ছি একবার লাট্টু পাহাড়টা দেখে আসতে। যাবেন নাকি?'

'যাব কি? আমি তো যাচ্ছিই।' এই বলে তিনি ঠোঙা থেকে ল্যাংচা তুলে টপাটপ গিলে ফেলতে লাগলেন।

এ এক হাসবার মতন দৃশ্য! অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ধূমকেতু। আমি তাঁকে বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি করার দরকার

নেই। আমিও দু'চারটে টেস্ট করে নিই।' এই বলে দোকানের ভেতর দিকে উঁকি দিলাম। উদ্দেশ্য, যদি একটা খালি বেঞ্চি-টেঞ্চি পাওয়া যায়।

আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাঁচজনের একটি ফ্যামিলি (আমার আন্দাজ) একটা গোটা বেঞ্চিই খালি করে উঠে পড়লেন। আমি এবং ধূমকেতু সঙ্গে সঙ্গে সেখানে বসে পড়লাম।

দোকানের ভেতরে একটা টিনের বোর্ডের ওপর বাংলা হরফে লেখা রয়েছেঃ 'রাণাঘাটের কারিগর দিয়ে এখানে পানতোয়া বানানো হয়।'

আমাদের পাশের একটি বেঞ্চিতে বসেছিলেন দু'জন মধ্যবয়স্ক বাঙালী সাহেব। একজনের মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথায় মরুভূমির মতন ধূ ধূ টাক। মুখটা একটু চ্যপটা ধরনের, এবং বেশ পুরু ঠোঁট। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। প্রায় ছ-ফুট মতন লম্বা হবেন। বাঁ হাতটা অকারণে মুঠো করে আছেন। পরে আবিষ্কার করেছিলাম—ঠিক অকারণে না, ওঁর বাঁ হাতের অনামিকাটি প্রায় গোড়া থেকেই কাটা! ইনি চুরুট এবং ল্যাংচা একই সঙ্গে খাচ্ছেন। টিনের বোর্ডটির দিকে আমি তাকিয়ে আছি দেখে বলে উঠলেন, 'রাণাঘাটের জমিদার মিলন দে চৌধুরী এক সময় এই দোকানের সাবেক মালিককে এখানে নিয়ে এসে বসান। ওদের দোকান ছিল রাণাঘাটের বড়বাজারে। খুব নামকরা কারিগর ছিল। ওরই বংশধর হচ্ছে এই আবু ময়রা।'

আবু ময়রা ওঁর কথা শুনে আমার দিকে তাকিয়ে ফোকলা মুখে একগাল হেসে বললেন, 'শিমুলতলার ল্যাংচাকে আমরাই বিখ্যাত করে তুলেছি। যাঁরা জানেন, তাঁরা শিমুলতলায় এলেই একবার আমার দোকানে পদধূলি দিয়ে যান।'

চুরুটধারীর পাশের ভদ্রলোক কালো চশমাধারী। ভয়ঙ্কর বীভৎস চেহারা। যেমনি কালো, তেমনি মোটা। মুখের গঠন অনার্যসুলভ। ইনি ল্যাংচা গিলতে গিলতে বললেন, 'আমি তো আজ পাঁচ বছর

এখানে আসছি। গত বছর বাজি ধরে আড়াই কিলো খেয়েছিলাম, মনে আছে?'

'তা আবার মনে থাকবে না! আপনি আমার মান বাড়িয়ে দিয়েছেন স্যার। আপনার কাছ থেকে দাম নেব না।' বললো আবু ময়রা।

দোকান তখন প্রায় ফাঁকা হয়ে এসেছিল। কেননা, ওদিকে আলো ফুরিয়ে এলে লাট্টু পাহাড়ের চেহারাটা ভাল করে দেখা যাবে না, তাই অনেকেই পথে বেরিয়ে পড়েছিল।

কালো চশমাধারী বললেন, 'ও-কথা আর ব'লো না। তাহলে তোমার অনেক লোকসান হয়ে যাবে। দেখছো তো, আমরা এখন চারজন আছি।'

আবু হেসে বললো, 'লোকসান কেন বলছেন বাবু, এ তো আমার সৌভাগ্য। জীবনে তো লাভ কম করলাম না, কিন্তু দুঃখের বিষয় দুঃখটাই ঘুচলো না।'

ধূমকেতু বললেন, 'এ যে দর্শন দেখছি!'

চুরুটধারী বললেন, 'দর্শনের মূল তত্ত্ব!'

চশমাধারী সঙ্গীর দিকে ফিরে বললেন, 'চল হে চন্দ, দেরি করলে সূয্যি আবার নিভে যাবে।' তারপর আবুর দিকে ফিরে বললেন, 'কত হলো তোমার দাম?'

আমরা দাম মিটিয়ে রাস্তায় নামলাম। লাট্টু পাহাড়ে পৌঁছাতে মিনিট দশেক লাগলো।

পথেই ভদ্রলোক দু'জনের সঙ্গে আলাপ হলো। চশমাধারীর নাম বলরাম কুণ্ডু। বড়বাজারে গদী আছে। মস্তবড় বিড়ির কারবারী। বিখ্যাত 'সুখটান' বিড়ি ওঁদেরই তৈরী। এখানে মাকসুদ সাহেবের আড়তে এসেছেন কেন্দুপাতার অর্ডার নিতে। বলরামবাবুর সঙ্গীর নাম গোপাল চন্দ। কাজ করেন আরবের একটি তেল কোম্পানীতে। দেশে এসেছেন ছুটি কাটাতে। এখন শিমুলতলায় এসেছেন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে।

ওঁরা দু'জন পাহাড়ে উঠলেন। আমরা কোনরকমে ওঁদের কাটিয়ে দিয়ে সেন সাহেবের কুঠী-বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। ধূমকেতু বললেন, 'এ কোথায় যাচ্ছি?'

'রহস্যের দ্বারে।' বললাম আমি।

ধূমকেতুর চোখ-মুখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। দু'হাতে মুঠো পাকিয়ে শিরদাঁড়া সোজা করে ফেললেন। স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে এখন ওঁকে বেশি লম্বা লাগছে। বললেন, 'আমি তাহলে এবার ওয়াটসন হয়ে যাব। আর আপনি হবেন শার্লক হোমস্।'

'কেন, আমার গণেশ হালদার নামটা আপনার পছন্দ নয়?'

'কিছু মনে করবেন না, আপনার নামটা বড্ড সেকেলে। তার চেয়ে আমার স্বপন চৌধুরী অনেক একেলে। স্বপন চৌধুরী কে বুঝতে পারলেন তো, আমার রহস্য সিরিজের গোয়েন্দা।'

'নামটা যদি আপনার আবিষ্কার হয়—'

'আবিষ্কার না, ওই নামের একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়তো। আপনি তো কেশনগরের লোক, রাণাঘাটের ইউসুফ ইনস্টিটিউসনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন।'

'আপনি কোন্ ইয়ারে স্কুল ফাইনাল পাস করেছেন?'

'ফিফটি সেভেনে।'

আমরা একটা বাগান-বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। চারদিকে জেলখানার মত উঁচু পাঁচিল। সামনেই বন্ধ লোহার গেট। একটু ডাকাডাকি করতেই দারোয়ান গেটটা খুলে দিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে নিয়ে গেল না। আমাদের পরিচয় জেনে নিয়ে সাহেবের কাছ থেকে পারমিশান আনতে গেল। আবার ফিরে এলো মিনিট-খানেকের মধ্যেই।

সেন সাহেবের বয়স গোটা পঞ্চাশেক হবে। অনেকটা গোপাল চন্দ্রের মতন চেহারা। তবে এঁর মাথায় টাক নেই, কিংবা এঁর বাঁ হাতের অনামিকাটিও কাটা নয়। ভদ্রলোক আমাদের দেখে বেশ খুশীই হলেন।

চা-বিস্কুটের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প-গুজব চললো। আমি গল্প লিখি শুনে সেন সাহেব আমাকে খুব তারিফ করলেন। ধূমকেতুর মত অনেক বই নাকি ওঁর পড়া।

আসল ধূমকেতু আনন্দে গদগদ হয়ে নিজেকে আর একটু হলেই এক্সপোজ করে ফেলতেন। কিন্তু আমার চোখের ইশারায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, 'ধূমকেতু ইজ মাই ফেবারিট রাইটার। এঁর "নীল সাগরের পাখি" আমার মনের মধ্যে সব সময়েই উড়ে বেড়াচ্ছে।'

'বইটা আমিও পড়েছি। নিকোবরের একটা দ্বীপকে পটভূমি করে পেঙ্গুইন পাখিদের নিয়ে লেখা না?' বলেই সেন সাহেব আমার দিকে তাকালেন।

আমি বিপদে পড়ে গেলাম। সত্যি কথা বলতে কি, ধূমকেতুর অনেক বইই আমার পড়া নেই। তার মধ্যে এই বইটাও পড়ে।

বিমলেন্দু ওরফে আসল ধূমকেতুই আমার হয়ে সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন। ওই দ্বীপে থাকতো এক কুখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার। সে পেঙ্গুইন পাখিদের সাহায্য নিয়ে সাগরে মাছ ধরতো। আর সেই মাছের পেটের মধ্যে পুরে দেশ-বিদেশে চালান দিত সোনা। শেষ পর্যন্ত ধরা পড়লো স্বপন চৌধুরীর হাতে।'

আমরা ঘুরে ঘুরে সেন সাহেবের পুকুরগুলো দেখতে লাগলাম। আলো কমে এলেও ইলেকট্রিক লাইটের ব্যবস্থা থাকায় বিশেষ অসুবিধা হলো না।

সেন সাহেব জানালেন যে, এ-সব পুকুরে কেবল রুই, কাতলা আর মৃগেলের চাষ হয়। ব্যবসায়ীর চোখ দিয়ে দেখলে এ-কারবারে বিশেষ লাভ নেই। তা না থাকলেও ইনি এতে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন। কথায় কথায় ইনি আরও জানালেন যে, আবুল মাকসুদকে ইনি ভালভাবেই চেনেন। তবে তাঁর ভাই ইলতাফ হোসেনকে আজ পর্যন্ত চোখে দেখেননি।

ফেরার পথে স্টেশন হয়ে এলাম। সন্ধ্যার পরে বা আগে সবাই

একবার স্টেশনে যায়। এটাই এখানকার রেওয়াজ। কলকাতাগামী মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার এ-সময় শিমুলতলায় থামে। এই ট্রেনটা না দেখে বড় একটা কেউ বাসায় ফেরে না।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে আমরা মাকসুদ সাহেবের আড়তে গেলাম। অফিসঘরে বসে কথাবার্তা বলছি, এমন সময় বলরাম কুণ্ডু ও গোপাল চন্দ এলেন। এঁদের সঙ্গে আমাদের মিষ্টির দোকানে আলাপ হয়েছে শুনে মাকসুদ সাহেব একটু রসিকতা করে বললেন, 'এই ব্যাপারটায় তাহলে আপনাদের বেশ মিল আছে।'

আমি বললাম, 'ভারতীয় মাত্রেরই মিল আছে। মিষ্টি ভালবাসে না সেরকম লোক এদেশে কম জন্মায়।'

চন্দ বললেন, 'জবাব নেই, মনে রাখার মতনই একটা কথা বলেছেন।'

এরপর কথায় কথা বাড়লো, কিন্তু আসল কাজ কিছুই হলো না। রাত আটটার সময় আমি আর মাকসুদ সাহেব বাড়ি ফিরলাম। কুণ্ডু আর চন্দ গেলেন হোটেলে। আর ধূমকেতু গেলেন 'সুধাকুঞ্জে'।

রহিমের রান্নার হাতটা বেশ ভাল। চিকেন দো-পেঁয়াজা চমৎকার রান্না করেছে। কোনো বড় হোটেলে ও চেষ্টা করলে পাচকের কাজ পেতে পারে।

খাওয়ার পর রহিম আমাকে একখিলি পান দিল। আমি পান খাই না। কিন্তু রিফিউজ করলাম না। ঘরে এসে দরোজা ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করে দিলাম। তারপর মুখে দেওয়ার আগে পানের খিলিটা খুলেই অবাক হয়ে গেলাম। তার ভেতর এক টুকরো কাগজ। কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরতেই কয়েকটি কথা যেন ফুটে উঠলো: দরোজা ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করবেন না। বারোটার পর আমি দেখা করবো। অনেক কথা ও কাজ আছে।'

কে লিখছে, কাকে লিখছে, তার কোনো উল্লেখ নেই। ধরে নিলাম রহিম আমাকেই লিখেছে। কিন্তু রহিম আসলে কে? পুলিশের লোক? সন্তোষদা ওকে নিয়োগ করেছেন কি?

যাই হোক, সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে ঠিক করলাম দরোজাটা ভেজিয়ে রাখবো। এমন-তেমন হলে রিভলভারটা তো সঙ্গেই রয়েছে!

বারোটার কয়েক মিনিট পরেই দরোজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। আমি অন্ধকারে দেওয়ালের পাশে সরে দাঁড়াতেই আগন্তুক দরোজাটা ছিটকিনি এঁটে বন্ধ করে দিয়ে ফিসফিসে গলায় বললো, আমি রহিম।'

ফিসফিসে গলার একটা অলৌকিক শক্তি আছে বলে মনে হয়। কেননা নিজের গলার আওয়াজকেও অন্যরকম মনে হয়। তার ওপর অচেনা পরিবেশ, ঘুটঘুটে অন্ধকার হলে তো কথাই নেই। সম্ভবত এই কারণেই রহিমের গলাকে আমি ঠিক চিনতে পারলাম না। ডান হাতে রিভলভারটা শক্ত করে ধ'রে বাঁ হাতে সুইচ টিপতে গেলাম। সুইচ-বোর্ডটা আমার হাতের মধ্যেই রয়েছে।

আবার ফিসফিসে গলায় আগন্তুক বলে উঠলো, 'আলো জ্বালবেন না, মাকসুদ সাহেব জানতে পারবেন। আমার হাতে পেনসিল টর্চ আছে, ঝর্নার আসল রহস্যটা দেখবেন চলুন।' এই বলে সে সত্যি সত্যি পেনসিল টর্চ জ্বেলে আমার উল্টোদিকের দেওয়ালের ধারে আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর চাবি ঘুরিয়ে আলমারির পাল্লা দুটো খুলে ফেললো। বললো, 'আমার পেছন পেছন আস্তে আস্তে আসুন।'

এবার আর চিনতে ভুল হলো না। লোকটি সত্যিই রহিম। ওর গলার স্বর কিছুটা স্পষ্ট ছিল।

এই আলমারিটা আসলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড ফ্লোরে যাওয়ার একটি গুপ্ত সিঁড়ি-দরোজা। ভিতরে ঢুকে রহিম দরোজাটা বন্ধ করে দিল। যেতে যেতে ও বললো, 'কাল যাকে টিলার ওপর আবৃত্তি করতে দেখেছিলেন সে-ই ইলতাফ হোসেন।'

ইলতাফ হোসেন! তখনই অবশ্য আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। সন্তোষদা হলে নিশ্চয়ই ব্যাপারটা ধরতে পারতেন। কিন্তু

আমি যে গণেশ হালদার, আমার ঘটে যদি অত বুদ্ধি থাকতো, তাহলে তো চেম্বারে বসেই রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারতাম।

আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে নেমে রহিম এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে চললো ডানদিকের দেওয়ালের পাশে। আমিও ওকে অনুসরণ করলাম। দেওয়াল ঘেঁসে দু'জনেই সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। মনে হয় ঝর্না-ঘরের দিকেই এগিয়ে চলেছি। কেননা জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রহিম এ-সময় আমার কানে কানে বললো, 'ঝর্না-রহস্যের লাস্ট সিনটা এবার আপনাকে দেখাবো।' এই বলে ও সামনের দিকে আবার এগিয়ে চললো।

এই রহিমটা আসলে কে? মাকসুদ সাহেবের চেলা, না পুলিশের টিকটিকি?···আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন হিম হয়ে আসছে। রিভলভারটা যদিও ডান হাতে ধরে আছি, তবুও আত্মবিশ্বাস ক্রমশ যেন হারিয়ে যাচ্ছে।

আমরা একটা ভেজানো দরোজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। রহিম আস্তে আস্তে তার পাল্লা দুটো একটু ফাঁক করে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠলো। ভয়ঙ্কর দৃশ্য! আবুল মাকসুদের দিকে রিভলভার তাক করে দাঁড়িয়ে আছেন সেন সাহেব। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বলে চলেছেন, 'গণেশ হালদারকে কেন ডেকে এনেছ বলতেই হবে।'

মাকসুদ সাহেব বললেন, 'কে গণেশ হালদার; আমি চিনি না।'

'চেন না! যে লোকটি তোমার বাড়িতে গেস্ট হয়ে রয়েছে তাকে তুমি চেন না?'

'তিনি তো রাইটার। তাঁর নাম হচ্ছে সুধারঞ্জন দে। তিনি কেন গণেশ হালদার হতে যাবেন?'

'তিনিই গণেশ হালদার।'

'আমি জানি না।'

'মানলাম জান না। কিন্তু তাকে আমার বাড়িতে পাঠিয়েছিলে কেন জানতে চাই।'

'আমি পাঠাইনি, তিনি নিজেই গিয়েছিলেন।'

'নিজেই গিয়েছিলেন। এখনও সত্যি কথা বল।'

কিন্তু তার আগেই পেছন দিকের কোনো গুপ্ত দরোজা দিয়ে দুটো লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই সেন সাহেবকে পেছন থেকে আক্রমণ করলো এবং তাঁর হাত থেকে রিভলভারটা ছিনিয়ে নিল।

আরে, এঁরা তো দেখছি বলরাম কুণ্ডু আর গোপাল চন্দ!

কিন্তু একী কাণ্ড! মেঝের এদিকটা হঠাৎ তিনজনকে নিয়ে বসে যাচ্ছে কেন?

হঠাৎ বলরামের হাতের পিস্তল গর্জন করে উঠলো। কিন্তু মাকসুদ সাহেব বড় সেয়ানা। তিনি তার আগেই ওদিকটার মেঝের ওপর শুয়ে পড়েছেন। আর শুয়ে পড়েই হা-হা-হা-হো-হো করে হাসতে হাসতে গড়াতে লাগলেন। বসে যাওয়া মেঝের অংশ থেকেও আর্ত-কলরব ভেসে আসছিল। কিন্তু সব কিছুকেই ম্লান করে দিল ঝর্নার কল-কণ্ঠ। আর আশ্চর্য, ওদিকেই একটি গুপ্ত দরোজা দিয়ে ঘরে ঢুকলো একটি যুবক। তার হাতে ঝকঝকে ছোরা। তার অট্টহাসি ঝর্নার কলকণ্ঠকেও হারিয়ে দিল। এক দমে অনেকক্ষণ ধরে হাসলো সে।

যুবকটিকে দেখেই মাকসুদ সাহেব গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'ইলতাফ হোসেন, তুমি এখানে!'

'হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত আসতে বাধ্য হলাম আমি। এলাম তোমার বুকের রক্তে তোমারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে।'

'তার মানে?'

'মানে—তোমাকে খুন করে ওই ঝর্নার জলে ফেলে দেব আমি।'

'কেন?'

'এখনও বুঝিয়ে বলতে হবে?'

'হবে।'

'তবে শোন, কেন্দু-পাতার প্যাকিং-এর মধ্যে সোনার পাত ভর্তি করে দেশ-বিদেশে চালান দেওয়ার অপরাধ তুমি অস্বীকার করতে পার?'

'এসব তুমি কী করে জানলে?'

'জেনেছি নিজে খোঁজ-খবর নিয়ে। তুমি শুনলে অবাক হবে, এ-ক'দিন আমি ছায়ার মতন তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছি। তবে বরাবর পিছনে থেকে। আচ্ছা, একটা কথার জবাব দাও দেখি, নিজের দলের লোকদের তুমি ঝর্নার জলে ডুবিয়ে দিলে কেন?'

'ওরা আমার সঙ্গে বেইমানি করেছিল।'

'বেইমানি করেছিল? তাহলে তো তুমি বেশ করেছ। এবার নিজের শাস্তির জন্য তুমি প্রস্তুত হও।' ইলতাফ হোসেন কথা বলতে বলতে ছোরা উঁচিয়ে মাকসুদ সাহেবের দিকে এগিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে...।

মাকসুদ সাহেব হঠাৎ শুয়ে পড়েই ইলতাফ হোসেনের হাঁটুর ওপর এমন কায়দায় জোড়া লাথি মারলেন যে, সে উল্টো ঝর্নার মধ্যে ঝপাং করে পড়ে গেল।

'হাঃ—হাঃ—হাঃ! হোঃ—হোঃ—হোঃ! কে কাকে শাস্তি দেয় দেখ!'

আমার পিস্তলধরা ডান হাতটা ভীষণ নিসপিস করতে লাগলো। রহিম পিস্তলটা একরকম জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে দরোজা ঠেলে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে গেল। তারপর চড়া গলায় বলে উঠলো, 'এবার তোমার পালা মাকসুদ সাহেব।'

'কে! রহিম!' ভয়ে কাঁপতে লাগলেন আবুল মাকসুদ।

'না আমি মহম্মদ জলিল। রহিম আমার ছদ্মনাম। আমি হচ্ছি বিহার পুলিশের গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর।'

'তাহলে আমি কে! প্রাইভেট ডিটেকটিভ গণেশ হালদারের ভূমিকাই বা কী!'

'ওহো, বুঝেছি।'

'তাহলে লক্ষ্মী ছেলের মতন মাথার ওপর হাত তুলে এদিকে চলে এস।' বললেন জলিল সাহেব।

আবুল মাকসুদ কলের পুতুলের মতন আজ্ঞা পালন করলেন। কিন্তু ভুল করলেন ইন্সপেক্টর জলিল। রিভলভারটা আমার হাতে দিয়ে পকেট থেকে হাতকড়া বের করতে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে মাকসুদ সাহেব ছোঁ মেরে রিভালভারটা কেড়ে নিলেন।

বেচারা মাকসুদ সাহেব! আমি যত নিচু মানের ডিটেকটিভ হই না কেন, তবু আমি যে গণেশ হালদার, অর্থাৎ আমার নামের যে একটা বিশেষ শক্তি আছে, সেটা হয়তো তিনি জানতেন না। আমি সঙ্গে সঙ্গে ডান পা'টা বাড়িয়ে তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুর নিচে একটু কারসাজি করতেই কাজ হয়ে গেল। তিনি মেঝের ওপর চিৎ. হয়ে পড়লেন। ব্যস!

জলিল সাহেব রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে আমার হাতে দিলেন। তারপর কুখ্যাত স্মাগলার 'ভগবান'-এর হাতে বালা পরিয়ে দিলেন।

হ্যাঁ, স্মাগলার জগতে আবুল মাকসুদ 'ভগবান' নামেই পরিচিত। হরিদ্বারে, কাশীতে, কলকাতায়, কন্যাকুমারিকায় তাঁর আশ্রম আছে। প্রায়ই সশরীরে সে-সব জায়গায় তিনি হাজির হন। তাঁর বেশবাসই তখন আলাদা। গেরুয়াধারী, জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে দেখে বোঝাই যাবে না যে, তিনি অন্ধকার জগতের বাদশাহ। কত শিষ্য তাঁর! দেশ-বিদেশে কত তাঁর নাম! আমেরিকান জার্নালগুলো তো তাঁকে 'ভগবান' বানাতে আর কিছুই বাকি রাখেনি। ভগবান শ্রীমৎ গিরিধারী মহারাজের পায়ের ধুলো নিয়েছে কয়েক সহস্র লোক। (এসব কথা আগেই জানতাম। তবে মাকসুদ সাহেবই যে এই গিরিধারী মহারাজ, এবং তিনিই যে স্মাগলার জগতের 'ভগবান' এটা পরে জেনেছি ইন্সপেক্টর জলিলের কাছ থেকে।)

খানিক পড়েই ডি, এস, পি, রামপূজন প্রসাদ একগাড়ি পুলিশ ফোর্স নিয়ে হাজির হলেন 'শান্তিকুঞ্জ'-এ।

খবর ছড়িয়ে পড়লো সারা শিমুলতলায়। প্রবাসী-আবাসী সবাই

এসে হাজির হলেন ব্যাপার দেখতে। ধূমকেতুও এলেন। কিন্তু জনতাকে পাতালের দৃশ্য দেখার সুযোগ দেওয়া হলো না। কেবল ধূমকেতু মহাশয় অনেক কলকাঠি নেড়ে ঝর্না-ঘরে উপস্থিত হতে পেরেছিলেন।

ইন্সপেক্টর জলিল এবার পুরোপুরি হিরো। একটা সুইচ টিপতেই ঝর্না-ঘরের আধখানা বসে যাওয়া মেঝে আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এলো। আর আশ্চর্য, ইলতাফ হোসেনসহ মাকসুদ সাহেবের দলের লোকেরাও (যাঁদের তিনি ঝর্নার জলে ডুবিয়ে মারতে চেয়েছিলেন) উঠে এলেন সেই সঙ্গে। অবশ্য তাঁরা এখন আর কেউ সুস্থ অবস্থায় নেই। সবাই জল খেয়ে ঢোল-গোবিন্দ হয়ে গেছেন। শেষ পর্যন্ত অনেক কসরৎ করে তাঁদের চাঙ্গা করে তোলা হলো।

এরপর ইলতাফ হোসেন ছাড়া সবাইকেই চালান দেওয়া হলো সদরে। ডি, এস, পি, রামপূজন প্রসাদ আর ইন্সপেক্টর জলিলও সেই সঙ্গে গেলেন।

যাওয়ার আগে জলিল সাহেব বললেন, মাকসুদ সাহেব যেটাকে ঝর্না বলেছিলেন, ওটা আসলে মারণ-কূপ। মাকসুদ সাহেব ঘরে-বাইরের শত্রুদের ওখানে ডুবিয়ে মারতেন। ওটা তাঁরই সৃষ্টি। পাম্প-মোটরের সাহায্য একটা কৃত্রিম প্রস্রবণ ওখানে সৃষ্টি করা হয়েছিল। জমিদার মিলন দে চৌধুরীর চিতাভস্ম ওখানে নিক্ষেপ করা হয়েছে বলে তিনি যা যা বলেছিলেন, সে-সব নেহাৎই গল্প।

মিস্টার প্রসাদ নাকি আমার কাজে খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন। সন্তোষদা নাকি তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। এই মামলায় আমার সাহায্য নাকি দরকার ছিল। তাই সন্তোষদাকে বলে আমাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

জলিল সাহেব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন। আমি এখানে না এলে নাকি জলিল সাহেবের পক্ষে রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভবই হতো না। সেন সাহেবের মাছের চাষ দেখতে গিয়েই নাকি চাঁইগুলোকে জালে পুরতে আমি সাহায্য করেছি। কারণ আমি হচ্ছি মার্কামারা

প্রাইভেট ডিটেকটিভ! মাকসুদ সাহেব, সেন সাহেব, বলরাম কুণ্ডু, গোপাল চন্দ—এঁরা সবাই নাকি এক নজর দেখেই প্রখ্যাত (?) গণেশ হালদারকে চিনতে পেরেছিলেন। আর তারই ফলে নাকি ওঁদের নিজেদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়ে যায়। ওখান থেকেই ওঁদের ভুলেরও সূত্রপাত হয়। আর ভুল করলেই তার মাশুল যেমন সবাইকেই দিতে হয়, তেমনি ওঁদেরও দিতে হলো।

আমি মনে মনে সসম্ভ্রমে বললাম, 'ইন্সপেক্টর জলিল, জিন্দাবাদ! কাগজের ভাষায় আমি প্রখ্যাত গণেশ হালদার হতে পারি, কিন্তু গোয়েন্দাগিরিতে তোমার কাছে আমি নিতান্তই শিশু!'

একটু পরেই পুলিশ ভ্যানটি ছেড়ে দিল। আর সকাল বেলার দামাল সূর্যটা কুয়াশার লেপ-তোষক ছেড়ে তখনই যেন পূর্ব আকাশের মেঝের ওপর ডিগবাজি খেয়ে উঠে দাঁড়ালো। (আসল কথা হচ্ছে সূর্যের অস্তিত্ব সদ্যোমাত্তর আমার চোখে ধরা পড়লো)।

যোগীরাজ

[ছোট্ট ব্যাপার, কিন্তু খবরের কাগজের কল্যাণে ফুলে-ফেঁপে বিরাট হয়ে উঠেছিল। সারা কলকাতার লোক ভেঙে পড়েছিল সর্দার শঙ্কর রোডের পাঁচ নম্বর বাড়িতে। কলকাতার বাইরে থেকেও অনেকে এসেছিল চক্ষু সার্থক করতে। ভিড় সামলাতে টালিগঞ্জ থানার পুলিশ বাহিনীকে হিমশিম খেতে হয়েছিল। মহিলা আর পুরুষদের দুটো আলাদা লাইন করতে হয়েছিল। দুটো লাইনই লম্বায় প্রায় আধ মাইল করে গড়িয়েছিল। উদ্দেশ্য—একবার কেবল যোগীরাজ বাবা ভোলানন্দ গিরির দর্শন লাভ করা।]

যোগীরাজ বাবা ভোলানন্দ গিরি যে-সে সাধু নন। তন্ত্র-মন্ত্র আর যোগের ভেলকি দেখিয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যে অনেক শিষ্য-সেবক যোগাড় করেছেন। এবার তো গোটা আমেরিকাটাই তোলপাড় করে এলেন। হিপিদের অধিকাংশই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে। এ হেন ভোলানন্দ গিরি কলকাতায় এসে যদি ভক্তি-শ্রদ্ধা না পান, তাহলে বৃথাই তাঁর বিদেশ গমন। কিন্তু তিনি হয়তো কল্পনাই করতে পারেননি, ভক্তি-শ্রদ্ধার নমুনা এত বিশাল হবে।

সর্দার শঙ্কর রোডের পাঁচ নম্বর বাড়িটা টালিগঞ্জ থানা থেকে বেশী দূরে নয়। খুব বেশী হলে পাঁচশ' গজ। থানার ইনচার্জ বিনয় মজুমদার নিজের চেম্বারে বসে ভাবছিলেন, কে এই ভোলানন্দ গিরি? এঁর জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি কি কেবল হুজুগে খবরের কাগজগুলোর প্রোপাগাণ্ডা, না অন্য কিছু?

এমন সময় প্রাইভেট ডিটেকটিভ গণেশ হালদার বিনয়বাবুর চেম্বারে প্রবেশ করলো। ছ-ফুটের ওপর লম্বা গৌরবর্ণ চেহারা। নিখুঁত আর্য-প্যাটার্নের দেহ-সৌষ্ঠব। চোখ-দুটো ঈষৎ নীলাভ। মাথার চুলগুলো কটা-কটা। এখন যদি ওর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবির

বদলে প্যাণ্ট-কোট থাকতো, সাহেব বলে অনেকেই ওকে ভুল করতো।

গণেশকে দেখেই বিনয়বাবু যেন অকূল দরিয়ায় আশার আলোর সন্ধান পেলেন। বললেন, 'আরে—হ্যালো, মিস্টার হালদার, আপনার বাড়ির পাশেই না বাবা ভোলানন্দ—।'

'যোগীরাজের কথা বলছেন? পাশের বাড়িতে কেন, আমাদের বাড়িতেই তো তিনি চরণধুলি দিয়েছেন।'

'ব্যাপারটা কি বুঝিয়ে বলুন দেখি।'

'তাহলে দয়া করে আমার সঙ্গে চলুন।'

'কোথায়?'

'আমাদের বাড়িতে। যোগীরাজের লীলাখেলা যদি নিজের চোখে দেখতে চান, তাহলে এখনি চলুন, দেরি করবেন না। আর যদি যেতে না চান, ওঁর নামে একটা ওয়ারেণ্ট বের করার ব্যবস্থা করুন। অন্য কোনো অফিসারকে আমার সঙ্গে পাঠালেও চলবে।'

'এ তো দেখছি আরও ধাঁধায় ফেললেন।'

'তাহলে ভেঙেই বলি—বাঁকাচাঁদকে মনে আছে?'

'মনে থাকবে না! ব্যাটা সেবারে হাতের মুঠো থেকে ফসকে গেছে।'

'সেই বাঁকাচাঁদ এবার আবার আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে। তিন বছর আমেরিকায় থেকে শ্রীমান একেবারে গুরুদেব বনে গেছে।'

'তাহলে এই যোগীরাজই কি সেই বাঁকাচাঁদ?'

'নিশ্চয়ই।'

'কোনো প্রমাণ আছে?'

'প্লাসটিক সার্জারির কল্যাণে প্রমাণ অবশ্য সে লোপাট করে দিয়েছে। তবে ডান হাতের তর্জনীটা একটু টিপেটুপে দেখা যেতে পারে। কারণ আশীর্বাদ করার সময় ওটাকে একবারও সোজা হতে কিংবা নড়তে দেখা যায়নি। তাছাড়া ওর বাঁ চোখটা আগের মতই একটু ট্যারা আছে।'

'ট্যারা আছে!' বলেই প্রায় চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন বিনয়বাবু। 'চলুন এখনি ব্যাটার কোমরে দড়ি বাঁধবো।'

পাঁচ নম্বর বাড়ির গ্রাউণ্ড ফ্লোর। মিস্টার প্রেমচাঁদ আগরওয়াল এর একাংশের দখলদার। বড়বাজারে গদি আছে। বিরাট মসলার কারবারী। অন্য অংশটি দখল করে আছেন প্রখ্যাত প্রাইভেট ডিটেকটিভ গণেশ হালদার। প্রেমচাঁদের সঙ্গে গণেশের ইদানীং একেবারে গলায়-গলায় ভাব!

গণেশের উসকানিতেই প্রেমচাঁদ যোগীরাজকে 'কল' দিয়ে নিয়ে এসেছেন। তিনি অবশ্য মন্তর নেওয়ার জন্যই এই আমেরিকা-ফেরত গুরুটিকে বরণ করে ঘরে তুলেছেন। আগামীকাল সেই মন্তর নেওয়ার দিনটি ধার্য হয়েছে। তার আগেই খবরের কাগজগুলোর প্রচারে গুরুজীর আগমনবার্তা রটে গেছে। আর তার ফল যে কী হয়েছে, তা আগেই বলা হয়েছে।

যোগীরাজ বসে আছেন পদ্মাসনে। তাঁর ডানপাশে বসে আছেন জন রিচার্ডসন একজন আমেরিকান শিষ্য। বাঁপাশে আছেন প্রেমচাঁদ আগরওয়াল। আর পিছনে বসে আছেন দু' সার অন্যান্য দেশী-বিদেশী শিষ্য। এঁদের সামনে দিয়ে মানুষ সার বেঁধে এগিয়ে চলেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোডের দিকে। লাইনটা আসছে রাজা বসন্ত রায় রোড ধরে। যোগীরাজকে দেখার পরই বাড়ির বাইরে গিয়ে লাইনটা অবশ্য ভেঙে যাচ্ছে। পুলিশ তাদের হটিয়ে দিচ্ছে পশ্চিমে—এস পি, মুখার্জী রোডের দিকে।

রাত এখনো বেশী হয়নি—আটটা বেজে কয়েক মিনিট মাত্তর হয়েছে। এমন সময় টালিগঞ্জ থানার ইনচার্জ বিনয় মজুমদারকে নিয়ে গণেশ হালদার হাজির হলো যোগীরাজের সামনে। একজন ইনস্পেক্টর কাছে আসতেই বিনয়বাবু তাঁর কানে কানে কি যেন বললেন। ইনস্পেক্টর চলে গেলেন বাইরে। একটু পরেই একদল ফোর্স নিয়ে তিনি বাড়ির ভেতর ঢুকলেন। দু-তিন মিনিটের মধ্যেই

পুলিশ-বাহিনী বাড়িটা ফাঁকা করে দিয়ে দু-দিকের গেট বন্ধ করে দিল। ইনস্পেক্টর আবার ও-সির কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

যোগীরাজ এতক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন। গণেশ হালদার কিংবা বিনয় মজুমদারকে দেখেননি। কিন্তু ভিড় হঠানোর গোলমালে তাঁর ধ্যান ভেঙে গেল। তিনি চোখ মেলে চাইতেই ব্যাপারটা দেখতে পেলেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। তিনি আবার চোখ বুজলেন। কিন্তু বিনয়বাবুর পুলিশী দৃষ্টিতে তাঁর বাঁ চোখের ট্যারা ভাব ওই একবারেই ধরা পড়ে গেল।

প্রেমচাঁদ এবং অন্য শিষ্যরা কিন্তু চুপ করে রইলেন না। তাঁরা বিনয়বাবুর কাছে পুলিশের এরকম আচরণের কৈফিয়ৎ তলব করলেন।

বিনয়বাবু তাকালেন গণেশ হালদারের দিকে। গণেশ হালদার বললো, 'যদি অনুমতি পাই, মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দু-চার কথা বলবো। তাতে এঁদেরও দাবি পূরণ হবে, আর জনসাধারণও শান্ত হবে।'

বলা বাহুল্য, গণেশ হালদারের প্রস্তাবে বিনয়বাবু যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই।'

মাইকের ব্যবস্থা আগে থেকেই করা হয়েছিল। অবশ্য ভক্ত-বৃন্দকে নির্দেশ দেওয়ার জন্যই তা করতে হয়েছিল। গণেশ হালদার তার সামনে দাঁড়িয়ে জনসভার বক্তার মত বলতে লাগলো, 'বন্ধুগণ, আপনারা শান্ত হন। আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ গণেশ হালদার, পুলিশের অনুমতি নিয়ে কয়েকটা কথা বলছি। আপনারা যাকে দেখার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, সেই যোগীরাজ বাবা ভোলানন্দ গিরির আসল পরিচয় আপনাদের কাছে আমি উদ্ঘাটন করবো।'

যোগীরাজ চমকে উঠলেন। চোখ খুলে ডাইনে-বাঁয়ে-পিছনে শিষ্যদের দিকে তাকালেন। তারপর শিষ্য-সেবকসহ উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু বিনয়বাবু তাঁদের বসিয়ে দিলেন।

ওদিকে গণেশ হালদার বলে চললো, 'এই যোগীরাজের আসল নাম হচ্ছে বাঁকাচাঁদ। ইনি ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকা আর জাপানে চোরা পথে চালান দেন গাঁজা—লক্ষ লক্ষ টাকার গাঁজা। কিন্তু এঁর কাজ-কারবার এমন নিখুঁত যে পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও এঁকে ধরতে পারেনি। আজ ইনি নিজেই এসে ধরা দিলেন।'

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন যোগীরাজ, 'থামুন, কাকে বাঁকাচাঁদ বলছেন জানেন!'

মাইক ছেড়ে গণেশ হালদার এবার যোগীরাজের মুখোমুখি দাঁড়ালো। বললো, 'একথা আপনার বাঁ চোখকে জিজ্ঞেস করুন।'

'বাঁ চোখকে! কেন, ট্যারা বলে?'

'ঠিক তাই। আরও একজনকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

'কে সে?'

'আপনার নিজেরই ডান হাতের তর্জনী।'

এবার যোগীরাজ স্বমূর্তি ধারণ করলেন। বললেন, 'শুধু এই দুটো প্রমাণ দেখিয়ে আমাকে ধরে রাখা যাবে না।'

বিন্দুমাত্তর না দমে গণেশ হালদার বললেন, 'আরও অনেক আছে। সেগুলো আর এখানে ফাঁস করবো না। কোর্টেই তা বলা যাবে।'

এবার যোগীরাজ মুষড়ে গেলেন। তাঁর মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বাঁ চোখটা আরও ট্যারা হয়ে গেল। এবং বাঁ দিকে শরীরটা একটু বেঁকিয়ে যেন সত্যিকারের বাঁকাচাঁদে পরিণত হলেন।

আগের সেই ইনস্পেক্টর একটি পুলিশ ভ্যান নিয়ে আবার ফিরে এলেন রঙ্গস্থলে। যোগীরাজ সপারিষদ গ্রেফতার হলেন। প্রেমচাঁদ আগরওয়ালও রেহাই পেলেন না। কারণ মসলার বস্তার মধ্যে গাঁজা ভরতি করে দেশ-বিদেশে চালান দেওয়ার প্রধান দায়িত্ব ছিল তাঁরই উপর। তাই বন্ধু বলে গণেশ হালদার তাঁকেও ক্ষমা করলেন না। তাঁরই মাধ্যমে অবশ্য গণেশ হালদার যোগীরাজের আসল পরিচয় পেয়ে যায়।

আদালতের বিচারে যোগীরাজ বাবা ভোলানন্দ গিরি ওরফে

বাঁকাচাঁদ ও তাঁর সাগরেদদের দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হলো। খবরের কাগজগুলো এ-খবর আরও নানারকম রঙ চড়িয়ে খুব ফলাও করে ছাপলো। এতে তাদের বিক্রির মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

[পুনশ্চ খবরের কাগজগুলো অবশ্য প্রাইভেট ডিটেকটিভ গণেশ হালদারের নামও খুব বড় করে ছেপেছিল।]

সোনার ডিম

সো-ডিম না-ডিম র-ডিম কই ?
মুরগীওয়ালা আসছে ওই—
গণেশ হালদার বলছে, যাও,
ওর কাছেতে খবর নাও।

এই মুরগীওয়ালাটি কিন্তু যদু-মধু নন, একেবারে কেষ্ট-বিষ্টু ব্যক্তি। কেননা, ইনি হচ্ছেন কুশলনগর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। এঁর নাম শ্রীযুক্ত অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়। এঁর পূর্বপুরুষরা পেশায় ছিলেন জমিদার। এখন জমিদারি নেই, তবে দাপট আছে। মেজাজ তো আছেই।

অশোকবাবু নিজের পড়তি অবস্থাটাকে সাংলে নিয়েছেন বছর তিনেক হলো। সত্যি কথা বলতে কি, বছর তিনেক আগে এঁর পায়ের তলা থেকে মাটি প্রায় সরেই গিয়েছিল। কারণ জমি-জায়গা তো বিক্রি হয়ে গিয়েছিলই, বাড়িটা পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হয়েছিল। সম্বল ছিল শুধু ঐতিহাসিক কাছারী বাড়িটা। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়, ওই কাছারী বাড়িটার কাছি ধরেই ইনি নিজের হাবুডুবু অবস্থা-টাকে কূলে নিয়ে এলেন। এখন এঁকে পায় কে !

আসলে অশোকবাবু করেছেন কি জান ? ইনি নিজের শেষ-সম্বল কাছারী বাড়িটায় পোল্ট্রী গড়ে তুলেছেন। স্রেফ মুরগী-পালন আরম্ভ করেছেন। আরম্ভটা করেছিলেন ছোট করেই। মাত্তর শত খানেক মুরগী নিয়ে। শত এখন সহস্রে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশ-বিদেশে চালান দিচ্ছেন মুরগীর মাংস আর ডিম। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো অশোকবাবুর ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স। তিন বছরে ইনি জমিয়ে ফেলেছেন তিন লাখ। ফলে, প্রথমে জনসাধারণের, তারপর ইনকাম-ট্যাক্সের, আর সব শেষে সি-বি-আইএর নজরে পড়ে গিয়েছেন।

কথায় বলে, বাঘে ছুঁলে আঠেরো ঘা। পুলিশে ছুঁলে? সংখ্যায় তা প্রকাশ করা যায় না।

পুলিশ চেষ্টা করলে পারে না কি? তারা খবর পেয়েছে, অশোকবাবু শুধু মুরগীর মাংস আর ডিমই দেশ-বিদেশে চালান দেন না, সেই সঙ্গে সোনার ডিমও চালান দিয়ে থাকেন। ইনি নাকি একটি কুখ্যাত স্মাগলিং পার্টির (চোরাচালানকারী দলের) খপ্পরে পড়েছেন।

খবর পাকা, কিন্তু অশোকবাবুর কারবার আরও পাকা। ইনি সব দিকে আটঘাট বেঁধে কাজ করেন। সম্ভবতঃ পুলিশের মধ্যেও নিজের ইনফর্মার (সংবাদদাতা) রেখে দিয়েছেন। না হলে আজ দু-দিন ধরে সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সব জায়গায় তন্ন তন্ন করে খুঁজেও পুলিশ একটি সোনার ডিমও বার করতে পারলো না কেন? তাহলে কি খবরটা ভুয়ো?

পুলিশের রাজ্য, কেন্দ্র দু'মহলের বড় কর্তাদের অনেকেই অবশ্য খবরটাকে এখন ভুয়ো বলেই মনে করছেন। অথচ যে সি-বি-আই অফিসার তদন্ত করেছেন, তিনি এখনও এটাকে সত্যি বলেই দাবি করছেন।

রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের বড়কর্তা সন্তোষ বিশ্বাসের আত্মবিশ্বাস বরাবরই একটু কম। আর তা কম বলেই মাঝে মাঝেই একটা-না-একটা পুরস্কার ঘোষণা করে থাকেন। তার মানে, যখনই তিনি কোনো জটিল রহস্যের সম্মুখীন হন, পুলিশের পক্ষ থেকে পুরস্কার ঘোষণা করেন—রহস্য যে উদ্‌ঘাটন করতে পারবে, তাকেই দেওয়া হবে পুরস্কার। এবারেও তিনি তাই করলেন। পঁচিশ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে সব ক'টা খবরের কাগজেই বিজ্ঞাপন দিলেন।

বলা বাহুল্য, সারা ভারতে এই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য লোক কেবল একটিই আছে, যার নাম গণেশ হালদার।

গণেশ হালদারের পেশা হচ্ছে প্রাইভেট ইনভেসটিগেশন

(বেসরকারী তদন্ত)। আগে ও দক্ষিণ কলকাতায় রজনী সেন রোডে থাকতো। এখন ও দক্ষিণেই থাকে, তবে রজনী সেন রোডে নয়, রাসবিহারী মোড়ের কাছাকাছি সর্দার শঙ্কর রোডে। তোমরা যদি কখনও 'শ্রীহরি মন্দির'-এ যাও, তার উল্টো দিকের বাড়িটার একতলায় খোঁজ করলেই গণেশ হালদারের সাক্ষাৎ পাবে।

বিজ্ঞাপনটি যেদিন ছাপা হয়, সেদিন সকালে গণেশ হালদারের ঘুম ভাঙে টেলিফোন যন্ত্রটির আর্তনাদে। রিসিভারটি কানে লাগিয়ে ও বলতে লাগলো, 'হ্যালো০০০গণেশ হালদার স্পিকিং। ০০০ কে কথা বলছেন? অমর রায়? ০০০ বেশ, বলুন। ০০০ সোনার ডিম? ০০০ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন। ০০০ হ্যাঁ, কুশলনগরের অশোক চ্যাটার্জীর নাম শুনেছি। ০০০ তিনি পোল্ট্রী করেছেন, তাও জানি। ০০০ হ্যাঁ, জানি—কিছু দিন আগে একটা খবরের কাগজে তাঁর ছবি আর জীবনী বেরিয়েছে। তাঁর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে রিপোর্টার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কেমন করে বড়লোক হতে হয়। ০০০ কি বললেন। ০০০ ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—হাঃ হাঃ, তা হতে পারে, রিপোর্টার ভদ্দরলোকই তাঁর জীবনটাকে বিষিয়ে তুললেন। খবরের কাগজের পাতায় তাঁর জীবনী-টিবনী না বেরোলে হয়তো তিনি কোনোদিন পুলিশের নজরেই আসতেন না। হঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ। ০০০ সি-বি-আই অফিসারটির নাম সত্যপ্রসন্ন চৌধুরী? ০০০ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিলক্ষণ চিনি তাঁকে। প্রথম জীবনে তিনি কর্পোরেশনের ড্রেনেজ ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন। শেষে অকারণে লোকে বদনাম দিতে থাকলে সেখানকার চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এখনকার চাকরিতে জয়েন করেন। ০০০ নিশ্চয়ই, তিনি যে সোনার ডিমের কথা বলেছেন, তা ঘোড়ার ডিম হতেই পারে না। ০০০ ঠিকই, আমারও প্রশ্ন—সোনার ডিম গেল কোথায়? ০০০ ও, কে.—নমস্কার।'

যে অমর রায় এই মাত্তর গণেশ হালদারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললো, সে একজন শখের গোয়েন্দা। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান। গণেশ হালদারের সঙ্গে তার বেশ কয়েকবার বুদ্ধির লড়াইও হয়ে

গেছে। এবারেও সে হয়তো গণেশ হালদারের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে নামতে চায়। যারা সত্যিকারের লড়াকু লোক, তারা যত হারে, লড়াইয়ের স্পৃহা তাদের ততই বেড়ে যায়। এই তত্ত্ব মেনে নিলে অমর রায়কে লড়াকু বলে স্বীকার করতেই হয়।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে গণেশ হালদার সোনার ডিমের কথাই ভাবতে লাগলো। সোনার ডিম গেল কোথায়? সত্যপ্রসন্নর দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে অশোক চ্যাটার্জী সেগুলো কোথায় লুকিয়ে রাখতে পারে?

একবার যখন প্রশ্নটা গণেশ হালদারের মগজে সেঁধিয়েছে, উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত ওর স্বস্তি নেই। পুলিসের গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা সন্তোষ বিশ্বাসকে ও রিং করলো। তাঁর কাছ থেকে কয়েকটি কথা ও জেনে নিল। সত্যপ্রসন্নর টেলিফোন নম্বরটিও জেনে নিল।

টেলিফোনে সত্যপ্রসন্নকে পাওয়া গেল না। ফোন ধরলেন তাঁর সহকারী দীপক বসাক।

দীপকবাবু জানালেন সত্যপ্রসন্ন গতকাল তদন্তে বেরিয়েছেন। সম্ভবতঃ কুশলনগর গেছেন। তবে আজ সকাল আটটার মধ্যেই তিনি ফিরে আসবেন।

সত্যপ্রসন্নর সঙ্গে গণেশ হালদারের আগেই পরিচয় হয়েছে। তাঁর বাড়িতেও কয়েকবার ও গেছে। ভদ্রলোক সংসার-জীবনে নিঃসঙ্গ। গণেশ হালদারের মতন তিনিও চিরকুমার।

গণেশ হালদার যখন সত্যপ্রসন্নর বাড়িতে এলো, তখন বেলা প্রায় ন'টা। এসেই দেখে বৈঠকখানা-ঘরে অমর রায় আর দীপক বসাক মুখোমুখি বসে গল্প করছে।

অমর রায় গণেশ হালদারকে দেখেই মিটিমিটি হেসে উঠলো। তারপর বললো, 'আমি জানতাম আপনি এখানে আসবেন। তাই ঠিক করলাম এখানেই আপনার সঙ্গে দেখা করবো।'

'ভালই করেছেন। আরও ভাল করতেন যদি আরও একজনের

সঙ্গে দেখা করতেন।' বলতে বলতে গণেশ হালদার একটি সোফা দখল করলো।

'কে সে? অশোকবাবু?'

'না, তাঁর বস বীরেনবাবু।'

'বীরেনবাবু! তিনি আবার কে?'

'অভিনেতা বীরেন চক্রবর্তী। 'কবরখানার রহস্য' নাটকে যিনি ওয়ারেন্ট বাইশের চরিত্রে অভিনয় করছেন।'

'তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার লাভ কি?'

'দিলীপ দত্তকে সেটা জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

'দিলীপ দত্ত!'

'আরে মশাই, আপনি যে দেখছি আকাশ থেকে পড়লেন। অন্ধকার দুনিয়ার শাহজাদা দিলীপ দত্তকে চেনেন না! বীরেন চক্রবর্তীর এক নম্বর স্যাঙাৎ হচ্ছে এই দিলীপ দত্ত। আর অশোক চ্যাটার্জী হলো গিয়ে বীরেনের দু'নম্বর স্যাঙাৎ। এই দিলীপ দত্ত কিসের কারবার করে জানেন?'

'না তো।'

'আপনি জানেন, মিস্টার বসাক?

দীপকবাবু ছোট গলায় বললেন, 'জানাবার সৌভাগ্য হয়নি এখনও।'

'আমিই বলে দিচ্ছি।' বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন গৃহকর্তা সত্যপ্রসন্ন চৌধুরী। তিনি একটি সোফায় বসে চুরুট ধরালেন। তারপর বলতে লাগলেন: দিলীপ দত্ত কারবার করে মাটি নিয়ে। মাটি দিয়ে পুতুল তৈরি করে। সুন্দর সুন্দর পুতুল। নিজের হাতেই সে তৈরি করে। আর, সেই পুতুল বাক্সবন্দী হয়ে চালান যায় দেশ বিদেশে। শুধু পুতুল বিক্রি করে সে এত টাকা কামিয়েছে যে রাখবার জায়গা পাচ্ছে না।'

'বলেন কি!' অমর রায় বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো।

'আরও আছে। থাক সে-সব কথা। তারপর মিস্টার হালদার,

বলুন, কি খবর আপনি জানতে চান।' গণেশ হালদারের দিকে তাকিয়ে সত্যপ্রসন্ন কথাটা শেষ করলেন।

'সোনার ডিমের পুরো খবরটাই আপনি বলুন। আমরা দু-জনেই শুনবো। কি বলুন অমরবাবু?'

অমরবাবু গররাজি হওয়ার কথা নয়? সে তো সোনার ডিমের গল্প শুনতেই এখানে এসে বসে আছে।

প্রায় তখনই চায়ের সঙ্গে গরম গরম খাবার এলো? খেতে খেতে সত্যপ্রসন্ন আরম্ভ করলেন তাঁর গল্প। অন্য তিনজনও মুখ চালাতে লাগলো।

সত্যপ্রসন্ন যে গল্পটা বললেন, তার সারমর্মটা এরকম: ভারতবর্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার সোনা চোরা পথে চলে যাচ্ছে বিদেশে। যারা এসব কারবার করছে তারা এক-একটি ধুরন্ধর ব্যক্তি। ধরা-ছোঁয়ার বাইতে থেকে দিনের পর দিন তারা এসব কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এদের সবারই এক-একটা সামাজিক মুখোস আছে। কেউ ব্যবসায়ী, কেউ চাকুরে। যারা ব্যবসা করে, তারা সবাই প্রায় এক্সপোর্টার (রপ্তানীকারক)। কেউ চায়ের ব্যবসায়ী। পেটি ভর্তি কুইণ্টাল কুইণ্টাল চা পাঠাচ্ছে বিদেশে। বিশেষ বিশেষ পেটির মধ্যে ভরে দিচ্ছে সোনা। কেউ মসলার ব্যবসায়ী। বিশেষ নম্বরের মসলার বস্তার মধ্যে ভরে দিচ্ছে সোনার তাল। তারপর সেই সোনা চলে যাচ্ছে দেশের সীমানার বাইরে। কেউ চালান দিচ্ছে ডিম। হাজার হাজার টাকার ডিম। আর সেই ডিমের সঙ্গে পাইল দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনার ডিম। সাদা পলিথিনের কভারে সেগুলো এমনভাবে মুড়ে দিচ্ছে যে, কেবল চোখে দেখে সেগুলোর স্বরূপ বোঝবার উপায় নেই।

পূর্ব ভারতের সোনা-চোরদের বাদশাহ হচ্ছে বীরেন চক্রবর্তী। তার দুই সাকরেদ, দিলীপ দত্ত আর অশোক চ্যাটার্জী। দিলীপ দত্তটাকে জালে পোরা হয়েছে। অশোক চ্যাটার্জীকে পুরতে পারলে দুটোকেই একসঙ্গে টেনে তোলা হবে। আর বীরেন

চক্রবর্তীর মারণাস্ত্র তো অনেক আগেই সি-বি-আইএর হাতে এসে গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, সি-বি-আই, কাস্টমস, পুলিশ—সব জায়গাতেই বীরেন চক্রবর্তীর লোক আছে। তাদেরই সাহায্যে সে নির্ঝঞ্ঝাটে এতদিন ধরে এই কারবার চালিয়ে আসছে। পুলিশ ইনভেসটিগেশনে (তদন্তে) যাওয়ার আগেই সে খবর পেয়ে যাচ্ছে, ফলে আগে থাকতেই সমস্ত এভিডেন্স (প্রমাণ) সে লোপাট করে দিচ্ছে। আসলে সরষের মধ্যেই রয়েছে ভূত। বিপদ তো এখানেই। তা না হলে অশোক চ্যাটার্জী সোনার ডিম সরিয়ে ফেলতে পারে?

কুশলনগর অপারেশনের পরিকল্পনা নেওয়া হয় মাত্তর দু'দিন আগে। অথচ দু'দিন পরে ইনভেসটিগেশনে গিয়ে দেখা গেল সোনার ডিম হাওয়ায় উড়ে গেছে। সম্ভাব্য-অসম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজা হলো, কিন্তু কোথাও তার হদিস পাওয়া গেল না। অথচ খবরটা ছিল কনফার্মড (পাকা)।

হঠাৎ গণেশ হালদার সত্যপ্রসন্নকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো, 'আপনাদের অপারেশনের প্ল্যানটা কে কে জানতেন?'

'শুধু তিনজন। আমি, বসাক আর সন্তোষ বিশ্বাস।' বললেন সত্যপ্রসন্ন।

'আপনার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে এটাও সত্যি যে আপনাদের তিনজনের একজনের কাছ থেকে খবরটা বাইরে ছড়িয়েছে।'

'নিশ্চয়ই।'

এ-সময় দীপক বসাক সত্যপ্রসন্নর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আপনার সোনার ডিমের গল্পটা যে শুধু গল্প নয়, তার কোনো প্রমাণ আছে?'

সত্যপ্রসন্ন বললেন, 'আছে।'

'আছে?'

'আছে। যথাসময়ে তা অথরিটির কাছে প্লেস করবো।'

'তাহলে গেল কোথায়?'

'আমারও তো সেই প্রশ্ন—সোনার ডিম গেল কোথায় ?

অমরবাবু বললো, 'কোনো বেনামী লকারে নেই তো ?'

'নামী বেনামী সবরকম লকার-টকার দেখে নিয়েছি। নিরাকারটা কেবল বাকি আছে, কেননা, ওটা সাধকের কাজ, আমার দ্বারা সম্ভব নয়।'

অমরবাবু ঃ 'নিরাকার তো আজগুবী কথা।'

'কেন, আজগুবী কেন হবে ? হাওয়ার কোনো আকার নেই, তাই বলে হাওয়াটা কি আজগুবী ?'

'তাহলে বলতে চান সোনার ডিম হাওয়া হয়ে গেছে।' কথাটা বলেই অমর রায় অবিশ্বাসীর চোখে সত্যপ্রসন্নর দিকে তাকায়।

'একজ্যাকটলি।' একটু থেমে সত্যপ্রসন্ন দীপক বসাকের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে ওঠেন, 'আমাদের বসাক অবশ্য এসব হাওয়া-তত্ত্বে বিশ্বাস করে না। ও আপনার মতনই মনে করে আমার সোনার ডিমের গল্পটা নিছকই গল্প।'

দীপকবাবু এমন সময় বলে ওঠে, 'ঠিক তা নয়, স্যর।'

'তাহলে তোমার সার কথাটি এঁদের কাছে প্রকাশ কর।'

'যে ইনফর্মেশনের ওপর বেস করে আপনি ইনভেসটিগেশন করেছেন, তার মধ্যেই হয়তো কোনো গলদ আছে।'

'গলদ ইনফর্মেশনের মধ্যে নেই বসাক, গলদ আছে আমাদের নিজেদের মধ্যে। আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ ডবল রোল প্লে করেছে। কাজেই অশোক চ্যাটার্জী সময়মতন সাবধান হতে পেরেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মালগুলো সে সরালো কোথায় ? মিস্টার হালদার, আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন ?'

গণেশ হালদার বললো, 'সাহায্য করার জন্যই তো আমি এখানে এসেছি। আপনার এখানে আসার আগেই সন্তোষ বিশ্বাসের সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে। সোনার ডিমের গল্পটিকে তিনি সত্যি বলেই মনে করেন। আর সত্যি কথা বলতে কি, তিনি যেটা

সত্যি বলে মনে করেন, গল্প বলে সেটা উড়িয়ে দেওয়ার মতন স্পর্ধা আমার নেই। আর নেই বলেই তো আমি গণেশ হালদার।'

'তাহলে আজ থেকেই আপনি কাজে নেমে পড়ুন। আমি আপনার সঙ্গে থাকবো। মিস্টার রায়, আপনিও ইচ্ছা করলে এগিয়ে আসতে পারেন।' বলেই সত্যপ্রসন্ন অমর রায়ের দিকে তাকালেন।

'ইনি তো আমার আগেই এড়িয়ে এসেছেন। ইনি যে টেলিফোনে আমাকে খবরটা প্রথম জানিয়েছেন শুধু তাই না, আমার আগেই ইনি আপনার ডেরায় এসে হাজির হয়েছেন।'

অমরবাবু একটু লজ্জিত হলো। কিন্তু কোনো কথা বললো না।

'অলরাইট, তাহলে আজই আমরা কুশলনগর রওনা হব। সেখান থেকেই কাজ আরম্ভ হবে।' গণেশ হালদার বললো।

'আজই ?' অমর রায় প্রশ্ন করলো।

'হ্যাঁ, আজই। মিস্টার চৌধুরীর আপত্তি না থাকলে এখনই আমরা তাঁর গাড়িতে করে কুশলনগর রওনা হতে পারি।'

সত্যপ্রসন্ন বললেন, 'না, না, আপত্তি কিসের ? আমি তো কাজে নেমেই আছি। বসাক, তুমিও চল।'

কলকাতা থেকে কুশলনগর মোটরে ঘণ্টাখানেকের পথ। সত্যপ্রসন্ন নিপুণ হাতে এক ঘণ্টারও কম সময়ে নিজের জিপ গাড়িটাকে চালিয়ে নিয়ে এসে অশোক চ্যাটার্জীর কাছারী বাড়ির সামনে দাঁড় করালেন।

অশোকবাবু কাছারী বাড়িতেই ছিলেন। তিনি ওদের যথাযথ অভ্যর্থনা জানালেন।

কথাবার্তার মধ্য দিয়ে দীপক বসাক যখন জানতে পারলো যে, গতকাল সত্যপ্রসন্ন কুশলনগরে আসেননি, তখন সে একটু মনমরা হয়ে পড়লো, কিন্তু মুখে কিছু বললো না।

সত্যপ্রসন্নর সঙ্গে অশোকবাবুর আগেই মুলাকাত হয়েছে। তিনি

গোটা পোল্ট্রীটা ওদের ভাল করে দেখালেন। ওদের সকলের সব রকম প্রশ্নের উত্তরও ঠাণ্ডা মাথায় দিয়ে গেলেন। তারপর নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে ওপর-নিচের প্রতিটি ঘর ওদের স্বাধীনভাবে দেখতে দিলেন। শুধু তাই না, ওদের মধ্যাহ্ন ভোজেরও ব্যবস্থা করলেন। তারপর একজন কর্মচারীকে ওদের কাছে রেখে তিনি আবার চলে গেলেন কাছারী বাড়িতে, যেখানে রয়েছে তাঁর পোল্ট্রী।

অশোকবাবু বেডরুমটার ওপরেই অত্যাচার করা হলো বেশি। খাট থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি ফার্নিচার, মেঝে, ছাদ, দেওয়াল, এমন কি দেওয়াল ঘড়িটা পর্যন্ত খুলে-মেলে, নানান কায়দা-কানুন করে পরীক্ষা করা হলো। কিন্তু কোথায় সেই সোনার ডিম?

অনুসন্ধানের পর সত্যপ্রসন্নকে খুব অপ্রসন্ন দেখালেও দীপক বসাক আর অমর রায়কে বেশ প্রসন্নই দেখাতে লাগলো। আর গণেশ হালদার রইলো এদের মাঝামাঝি, অর্থাৎ নির্বিকার।

অমর রায় এ-সময় জিভ সামলাতে না পেরে বলে উঠলো, 'মিস্টার হালদার কি ভোঁতা হয়ে গেলেন নাকি।'

'আপনি কি তাহলে খুশী হন?' পাল্টা প্রশ্ন করলো গণেশ হালদার।

'আমার খুশী-অখুশীর কি আছে?'

গণেশ হালদারের হয়ে সত্যপ্রসন্নই জবাব দিলেন: এটা ঠিক ডিটেকটিভের মতন কথা হলো না মিস্টার রায়। আপনি এসেছেন আমাদের সঙ্গে জয়েন্ট ইনভেসটিগেশনে। সাফল্য-অসাফল্যের দায়-দায়িত্ব আমাদের সবারই এখন সমান।

দীপক বসাক বললো, কিন্তু স্যর, সোনার ডিমের গল্পটা কিন্তু আপনার নিজস্ব। ওটা যে সত্যি তা কিন্তু প্রমাণিত হলো না।'

এ-জন্য আমি দুঃখিত, বসাক। তবে একটা কথা জেনে রাখবে, সত্যপ্রসন্ন চৌধুরী কখনও মিথ্যে গল্প করে না।'

কিন্তু স্যর, অথরটি আপনার এই কথায় প্লিজ হবেন বলে তো

মনে হয় না। অশোকবাবু যদি মানহানির মামলা করেন, তাহলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে।'

গণেশ হালদার অশোকবাবুর ব্যক্তিগত চিঠির ফাইলটা ঘাঁটছিল। ও এ-সময় বলে উঠলো, 'অশোকবাবু সে সুযোগ পাবেন না, মিস্টার বসাক। তার আগেই স্টেপ নেওয়া হবে।'

অমরবাবু বললেন, 'কোনো এভিডেন্স পেয়েছেন?'

'আজ কিছু বলবো না। আপনারা বরং গল্প করুন; আমি টাউনটা ততক্ষণে ঘুরে আসি।'

অশোকবাবুর বাড়ি থেকে বেরিয়েই গণেশ হালদার একটা সাইকেল রিক্সা পেয়ে গেল। রিক্সায় উঠেই আদেশ করলো, 'হেড পোস্ট অফিস।' তারপর কয়েকটি নম্বর আর তারিখ—যেগুলো সে অশোকবাবুর ব্যক্তিগত চিঠির ফাইলে পেয়েছিল, সেগুলো মন থেকে উদ্ধার করে নোট বুকে সাংকেতিক ভাষায় লিখে ফেললো।

পোস্টমাস্টারটি খুবই সজ্জন ও বুদ্ধিমান লোক। গণেশ হালদারের পরিচয় পেয়ে ওঁর সব প্রশ্নেরই যথাযথ জবাব দিলেন, আর প্রতিশ্রুতি দিলেন আলোচনার বিষয়টি তিনি গোপন রাখবেন।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়াটা বেশ ভালই হলো। তারপর সংক্ষিপ্ত বিশ্রাম। সব শেষে বিদায়। অশোকবাবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের বিদায় জানালেন।

ওই দিনই সন্ধ্যায় গণেশ হালদার পুলিশ অফিসার সন্তোষ বিশ্বাসের কোয়ার্টারে হাজির হলো। মিসেস বিশ্বাস নিজের হাতে গরম গরম রাধাবল্লভী ভেজে ওকে খাওয়ালেন।

শুভ আর কল্লোল সন্তোষ বিশ্বাসের দুই নন্দন। বয়স যথাক্রমে দশ আর আট। কিন্তু এই বয়সেই ওদের যা তেজ, তাতে মনে হয় ওরাই যেন পুলিশ অফিসারের বাপ। ওরা গণেশ হালদারকে কাকু বলে ডাকে, আপনজন বলেও মনে করে। এই গল্পে ওদের উল্লেখ অবান্তর নয়। কেন, তা শেষে বলবো।

সন্তোষ বিশ্বাস গণেশ হালদারের সূত্রের কথা শুনে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। গণেশ হালদারের মগজের যে এত উন্নতি হয়েছে, তিনি তা জানতেন না। যাই হোক, তিনি গণেশ হালদারের কাছ থেকে ঠিকানাগুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট থানাগুলোর মারফৎ খোঁজ খবর নেওয়ার সেই দিনই ব্যবস্থা করলেন। ট্রাঙ্ককলে থানা অফিসারদের জানিয়ে দিলেন কি কি করতে হবে।

চারদিন পরের ঘটনা।

দুপুরটা কেবল গড়িয়েছে।

কুশলনগরে অশোকবাবুর কাছারী বাড়িতে সমবেত হয়েছেন সন্তোষ বিশ্বাস, সত্যপ্রসন্ন চৌধুরী, দীপক বসাক, গণেশ হালদার আর অমর রায়। তাছাড়া কুশলনগর থানার ইনচার্জ মোহিত ঘোষ, পোস্টমাস্টার রামমোহন শীল আর গৃহকর্তা অশোক চ্যাটার্জী তো আছেনই।

গণেশ হালদারের সামনে গোল টেবিলটার ওপর চারটে সিল করা রেজিস্টার্ড পার্সেল। ওগুলো অশোকবাবু পাঠিয়েছিলেন চারটে ভুয়ো ঠিকানায়। প্রথমটি পাঠিয়েছিলেন এম, কৃষ্ণমূর্তির নামে। ঠিকানা—৫৫এ, রঙ্গস্বামী রোড, মাদুরাই—১১। দ্বিতীয়টি পাঠিয়েছিলেন অনন্ত দেব বর্মণের নামে। ঠিকানা—২০ ডি, সহানন্দ রোড, আগরতলা। তৃতীয়টি পাঠানো হয়েছিল ভগবান সিং-এর নামে। ঠিকানা—২৫, গুরু নানক রোড, জলন্ধর—২। চতুর্থটি পাঠানো হয়েছিল ইলতাফ হোসেনের নামে। ঠিকানা—২২সি, মহম্মদ ইয়াসিন রোড, আলিগড়।

পার্সেলগুলো দেখিয়ে গণেশ হালদার বলতে শুরু করলো, 'যে-সব ঠিকানায় এগুলো পাঠানো হয়েছিল, সেগুলো যে ফল্‌স্‌ তা পোস্ট-অফিস আর পুলিস রিপোর্টেই আছে। তবে যিনি পাঠিয়েছিলেন, তিনি যে ফল্‌স্‌ নন, তা অবশ্য চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছেন।' এই বলে ও একবার অশোকবাবুর দিকে বাঁকা চোখে তাকালো।

অমর রায় বললো, 'এই পার্সেলগুলোর সাথে সোনার ডিমের কি সম্পর্ক ?'

'সম্পর্কটা এখনই আপনাদের দেখিয়ে দেব। অশোকবাবু, আপনি কি নিজের হাতে প্যাকেটগুলো খুলবেন, না কি অন্য ব্যবস্থা করতে হবে ?

অশোকবাবু নীরব রইলেন। তখন গণেশ হালদার তাকালো সন্তোষবাবুব দিকে। সন্তোষবাবু ইঙ্গিত করলেন থানা অফিসার মোহিত ঘোষকে। মোহিতবাবু সবগুলো প্যাকেটই খুলে ফেললেন। দেখা গেল সবগুলো প্যাকেটই ভর্তি রয়েছে ডিমে।

গণেশ হালদার তখন বললো, 'এই যে ডিমগুলো দেখছেন, এগুলোর ওজন হচ্ছে পাঁচ কিলোর একটু বেশি। এটা পোস্ট-অফিসের হিসেব। আর এই ডিমগুলো কিসের জানেন ?'

দীপক বসাক বললো, 'কিসের ?'

'একটা হাতে নিয়েই দেখুন। বলেই গণেশ হালদার একটা ডিম দীপকবাবুর হাতে তুলে দিল। তারপর বললো, 'কিসের ডিম বুঝতে পারছেন ?'

'না।'

'তাহলে এই দেখুন।' গণেশ হালদার দীপকবাবুর হাত থেকে ডিমটা নিয়ে একটা ছুরির সাহায্যে কভারটা তুলে ফেললো। আর সঙ্গে সঙ্গে আস্ত একটা সোনার ডিম আত্মপ্রকাশ করলো।

অশোক চ্যাটার্জী ছাড়া সবাই অবাক হয়ে ডিমটি দেখতে লাগলো।

গণেশ হালদার আবারও বলতে লাগলো, যেগুলো এখানে দেখছেন, সবই হচ্ছে সোনার ডিম। অশোকবাবুর মাথা আছে বলতে হবে। আগে থাকতেই ইন্‌ফর্মেশনটা পেয়ে তারিফ করার মতনই একটা চাল চেলেছিলেন। অমরবাবু যদি সেদিন সকালে আমাকে টেলিফোন না করতেন, এ-যাত্রায় উনি হয়তো উত্‌রে যেতেন। কেননা, পুলিশের ঝামেলা মিটে যেতে সপ্তাখানেকের বেশি সময়

লাগতো না। তারপর সোনার ডিমগুলো অক্ষত অবস্থায় ফেরত পেয়ে যেতেন।

অমর রায় বললো, 'অশোকবাবুকে কে ইনফর্মেশন দিয়েছিল?

'আমি জানলেও তা বলবো না। এ-বিষয়ে যা বলার মিস্টার চৌধুরীই বলবেন।

অশোক চ্যাটার্জী সহসা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে দীপকবাবুর ওপর চড়াও হলেন। তিনি বলে উঠলেন, 'হতভাগা শয়তান, পুলিশ আমার পার্সেল করার কথা কি করে জানলে বল। আমার কাছ থেকে টাকা খেয়ে আমারই ঘাড় মটকানো! আজ পর্যন্ত তুই আমার কাছ থেকে যত টাকা নিয়েছিস, সব আমি আদায় করে ছাড়বো।

সন্তোষ বিশ্বাস তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'নিশ্চয়ই। তবে এখানে নয়, কোর্টে। আপনার যা বলার আছে, তা সেখানেই বলবেন।'

দীপক বসাক প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল। সত্যপ্রসন্ন তাকে বিদ্রূপ করে বলে উঠলেন, 'থাক, আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। আমি সবই জানি। অশোক চ্যাটার্জীর সঙ্গে তোমাকেও যাতে জেলখানায় ঘানি ঘোরাতে হয়, তার ব্যবস্থা আমি করবো। মোহিত-বাবু, এদের ছ'জনেরই হাতে বালা পরিয়ে দিন।'

অশোক চ্যাটার্জী বললেন, 'আর বালা পরাতে হবে না, কোথায় যেতে হবে চলুন।'

'আপাততঃ লালবাজার। বলেই উঠে দাঁড়ালেন সন্তোষ বিশ্বাস।

* * *

বীরেন চক্রবর্তী আর দিলীপ দত্তকেও ওই দিনই অ্যারেস্ট করা হয়। আদালতে এদের অভিযুক্ত করতে কোনো অসুবিধাই হয়নি।

আদালতের বিচারে অন্ধকার ছনিয়ার তিন দিক্‌পতি—বীরেন চক্রবর্তী, দিলীপ দত্ত আর অশোক চ্যাটার্জীর দীর্ঘ মেয়াদের কারাদণ্ড হলো। বিশ্বাসঘাতক সি-বি-আই অফিসার দীপক বসাকও রেহাই পেল না। তারও উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হলো।

* * *

আদালতের রায় যেদিন বেরোলো, সেদিন সন্ধ্যার সময় পাঁচ নম্বর সর্দার শঙ্কর রোডের বাড়িতে বসে খবরের কাগজের রিপোর্টারদের কাছে গণেশ হালদার 'সোনার ডিম-এর গল্পটা বলতে আরম্ভ করার আগেই একটা ছড়া বলেছিল। ছড়াটা গোড়াতেই বলা হয়েছে, আরও একবার বলা হচ্ছে :

সো-ডিম না-ডিম র-ডিম কই ?
মুরগীওয়ালা আসছে ওই—
গণেশ হালদার বলছে যাও,
ওর কাছেতে খবর নাও।

ছড়া'র প্রথম লাইনটার 'সো-ডিম' আর না-ডিম এর 'ডিম' দুটো বাদ দিতে হবে। তাহলে লাইনটা হবে, 'সোনার ডিম কই ?'

বলা বাহুল্য, এই হেঁয়ালিপূর্ণ ছড়াটা খবরের কাগজগুলো ছাপাতে ভুল করেনি।

* * *

সন্তোষ বিশ্বাসের দুই ছেলে শুভ আর কল্লোল 'সোনার ডিম-এর গল্পটা গণেশ হালদারের মুখে বেশ কয়েকবার শুনেছিল। আর ছড়াটা তো মুখস্থই করে ফেলেছিল।

শুধু শুভ-কল্লোল কেন, ওদের বয়েসী সব ছেলেমেয়েরই গল্পটা ভাল লাগবার কথা। আর ছড়াটা ? ওটা তো ভাল লাগবেই।

এরকম বিজ্ঞাপন আগেও বেরিয়েছে। খবরের কাগজের আনাচে-কানাচে রোজ প্রায় গণেশ হালদারের চোখে পড়েছে। কিন্তু ঠিক এইটা কোনোদিন বেরিয়েছে কি না, গণেশ হালদার কিছুতেই তা মনে করতে পারলো না। কেননা, এ ধরনের বিজ্ঞাপনগুলো সবই প্রায় একই ভাষায় লেখা হয়ে থাকে। যেটুকু হেরফের দেখা যায়, তা কেবল বিজ্ঞাপনদাতাদের নাম ধামে।

তাহলে আজকে ওর চোখ দুটো খবরের কাগজের এই বিজ্ঞাপন-টার ওপরে হঠাৎ আটকে গিয়ে ট্যারা হয়ে গেল কেন? এর কী এমন বিশেষত্ব আছে?

না, বিজ্ঞাপনের ভাষায় নয়, গণেশ হালদারের চোখ দুটো আটকে গেছে এই বিজ্ঞাপনটির সঙ্গে ছাপা একজন জ্যোতিষ-পণ্ডিতের মুখের ওপর। এরকম মুখ কি আগে কোথাও দেখেছে ও?

এক মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, একেবারে ঘাড় পর্যন্ত নেমে আসা। রুক্ষ লম্বা দাড়ি গোঁফ সারা মুখটাকেই প্রায় ঢেকে ফেলেছে। চওড়া কপাল, বাঁ দিকের ভ্রূর ওপর একটি তেরছা কাটা দাগ। টিকলো নাক, তবে একটু যেন মোটা, মাঝখানের হাড়টা যেন আর সামান্য একটু উঁচু হলে আরও মানানসই হতো। আর চোখ দুটো সত্যিই টানা, যাকে বলে পটলচেরা, ঠিক সেই রকম।

এরকম চোখ হয়তো অনেকেই আছে, কিন্তু এরকম দৃষ্টি? দৃষ্টি দেখেই গণেশ হালদারের মনে হলো, জ্যোতিষী যেন সত্যিই সর্বজ্ঞসিদ্ধ পুরুষ। গণেশ হালদারের আরও মনে হলো, তিনি যেন দৃষ্টি দিয়ে ঘোষণা করছেন, এই বিজ্ঞাপনটি এ ধরনের আর পাঁচটি বিজ্ঞাপনের মত গ্যাজানো ব্যাপার নয়, বরং এতে যা যা লেখা হয়েছে তা সবই যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।

বিজ্ঞাপনটিতে লেখা আছে :

গ্রহশান্তির জন্য গ্রহ-মন্দিরে আসুন। ভারত ও পাশ্চাত্ত্য ডিগ্রীধারী প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌ জ্যোতিষ-সম্রাট গোপালাচার্য কর্তৃক গ্রহরত্ন ধারণের ব্যবস্থাপত্র একমাত্র এখানেই দেওয়া হয়। সময়—বিকাল ৩টা থেকে ৬টা। ফিস ১৫ টাকা। গ্রহ-মন্দির ১ডি, কালী টেম্পল রোড, কলকাতা-২৬। ফোন নম্বর : ৪৬-০২৭*।

গোপালাচার্য!...সন্ধি ভাঙলে দাঁড়ায় গোপাল আচার্য!...নাঃ, এরকম নামের কোন লোকের সঙ্গে আগে কোথাও পরিচয় হয়েছে কি না গণেশ হালদার কিছুতেই তা মনে করতে পারলো না।

তাহলে? তাহলে কেন ওর মনে হলো, এরকম মুখ আগে যেন কোথাও দেখেছে ও। বিশেষ করে জ্যোতিষীর চোখ দুটি যেন...।

গণেশ হালদার খবরের কাগজখানি টেবিলের ওপর পেপার-ওয়েট চাপা দিয়ে রাখলো। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো উত্তর দিকের বারান্দায়, যে দিকটায় আছে দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ প্রাইমারী স্কুল। পর পর দু-টিপ নস্যি নিল। আর নস্যি নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও যেন দিব্যজ্ঞান লাভ করলো।

সময় নষ্ট না করে তখনই ও চলে এলো ঘরের মধ্যে। আলমারি খুলে বার করলো সাত বছর আগের একটি পুরানো ফাইল—ওর ডিটেকটিভ জীবনের ব্যর্থতার একটি বোঝা।

ফাইলের মধ্যে একটি বড় খামের ভেতর ছিল পোস্টকার্ড সাইজের একটি ফটো। ফটোর মালিক অরুণ কর্মকার—একটি খুনের মামলার ফেরারী আসামী।

গণেশ হালদার ছবিটি নিয়ে এলো পড়ার টেবিলে, যেখানে বসে ও খবরের কাগজ পড়ছিল। খবরের কাগজে ছাপা গোপালাচার্যের ছবির সঙ্গে অরুণ কর্মকারের ছবিটি বার বার মিলিয়ে দেখলো। দু'জনের চোখের গড়নে আর চাহনিতে আশ্চর্য মিল আছে। কিন্তু গরমিল আছে দুটি জায়গায়। প্রথমতঃ অরুণের বাঁ দিকের গালে একটি বড় জরুল-চিহ্ন আছে, কিন্তু গোপালাচার্যের গালে তা আছে

কি না বোঝা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়তঃ, গোপালাচার্যের কপালের ওপর রয়েছে একটি কাটা দাগ, কিন্তু অরুণের কপাল দাগহীন, ভাঁজহীন, মসৃণ।

গণেশ হালদার আবার বারান্দায় এসে পায়চারি আরম্ভ করলো। আবার পর পর দু-টিপ নস্যি নিলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই আরও একবার যেন দিব্যজ্ঞান লাভ করলো।

তখনই ঘরের মধ্যে চলে এলো গণেশ হালদার। এসেই একটি কাজ করলো। ছবির গোপালাচার্যের দাঁড়ি-গোঁফ আর কপালের কাটা দাগটি দু-হাতের আঙুল দিয়ে ঢেকে ফেললো।

আশ্চর্য। এবার যেন সবই মিলে যাচ্ছে! অরুণ কর্মকার আর গোপালাচার্য যেন একই, অভিন্ন ব্যক্তি!

সঙ্গে সঙ্গে গণেশ হালদার টেলিফোনের রিসিভার বাঁ হাতে তুলে নিয়ে ডান হাত দিয়ে ডায়াল করতে লাগলো। গ্রহ-মন্দিরের ফোন নম্বর বিজ্ঞাপনেই লেখা রয়েছে। ওপার থেকে পুরুষ-কণ্ঠে আওয়াজ এলো, 'হ্যালো, গ্রহ-মন্দির।'

'আমি কি জ্যোতিষ-সম্রাটের সঙ্গে কথা বলছি?

'না, তিনি এখন পুজোয় বসেছেন।

আপনি কে কথা বলছেন?

'আমি তাঁর অ্যাসিস্টেন্ট, নাম সুধাংশু ভট্টাচার্য।

'আচ্ছা, আজ বিকেলে কি একবার জ্যোতিষ-সম্রাটের সঙ্গে দেখা হতে পারে?

'আজ বিকেলে? না, পনরোজন আগেই বুক করে রেখেছেন।

'কোনোরকম ব্যবস্থা কি করা যায় না?

'দু'সপ্তার আগে নয়। আপনি বরং…দাঁড়ান, একটু ধরুন, আমি একবার ডায়রীটা দেখে বলছি।'

'দেখুন, আজ বিকেলেই আমার একবার দেখা করা বিশেষ দরকার!

'তাহলে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় আসবেন। কেউ অ্যাবসেন্ট থাকলে ব্যবস্থা হতে পারে। আচ্ছা, নমস্কার।'

'নমস্কার। এই বলে গণেশ হালদার রিসিভারটি নামিয়ে রাখলো।

*　　　*　　　*

গণেশ হালদারের ডি:টেকটিভ জীবনে ব্যর্থতা অনেক এসেছে, কিন্তু কুচবিহারের এই মামলাটির মত অন্যগুলো ওর মনের মধ্যে এত খচখচ করে না।

কুচবিহারের প্রখ্যাত গয়নার দোকান 'জড়োয়া'। তার দুই অংশীদার—রামচন্দ্র কর্মকার ও লক্ষ্মণচন্দ্র কর্মকার। এরা সহোদর ভাই। রামায়ণের রাম লক্ষ্ম:ণের মতই এদের ভ্রাতৃপ্রেম।

দুই ভাইই কাজ শিখেছে কলকাতার একটি বড় নামকরা জুয়েলারী দোকানে। সেই দোকানেরই ওরা কারিগর ছিল। দশ বারো বছর ধরে চাকরি করার পর দেশের ছেলে দেশে ফিরে আসে। তারপর নিজেরাই ছোটোখাট একটি দোকান খুলে বসে।

এদের হাতের কাজ ছিল পরিষ্কার। কুচবিহারের রাজবাড়ির যাবতীয় গয়না এরাই তৈরি করতো। ফলে, এদের নাম ডাক অল্প দিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। দোকানও বড় হতে থাকে।

রামচন্দ্রের স্ত্রী এ সময় এগারো বছরের ছেলে অরুণকে রেখে মারা যায়। লক্ষ্মণচন্দ্র তখনও অবিবাহিত ছিল। তাই রামচন্দ্র নিজে বিয়ে না করে ছোটো ভাইয়ের বিয়ে দিল। বছর দুয়েক বাদে লক্ষ্মণচন্দ্রের একটি ছেলে হলো। তার নাম রাখা হলো বরুণ।

অরুণ ছিল ভীষণ একগুঁয়ে আর ডানপিটে। অবশ্য পড়াশুনোতেও খুব মাথা ছিল। কিন্তু তা থাকলে কি হবে, দুষ্টুমির দিকেই তার ছিল বেশী লক্ষ্য। তার ওপর বাড়ির সবার আদর পেয়ে পেয়ে একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু তার ভাগ্য ছিল খারাপ। মাকে আগেই হারিয়েছে, এবার বাবাকেও হারালো। রামচন্দ্র হঠাৎ একদিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল।

দাদার মৃত্যুর পর লক্ষ্মণচন্দ্র একাই দোকানে দেখাশুনো করতে লাগলো। বাপ মার অভাব যাতে অরুণ বুঝতে না পারে, সেদিকেও বিশেষ নজর রাখলো।

লক্ষ্মণচন্দ্র বোধহয় এখানে একটি ভুল করলো। বাপ-মার অভাবটা হয়তো অরুণকে একটু বুঝতে দেওয়া উচিত ছিল। কেননা, অরুণ এ সময় থেকে আরও বেশী করে বদ লোকদের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করলো। দুষ্টু বুদ্ধিতে কুচবিহারের মধ্যে সে প্রায় অদ্বিতীয় হয়ে উঠলো।

আরও কয়েক বছর কেটে গল। অরুণ হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করলো। স্থানীয় কলেজে বি. এস সিতে ভর্তি হলো। এ সময় তার কাকীমাও মারা গেল।

লক্ষ্মণচন্দ্র আর বিয়ে করলো না। মনে মনে ঠিক করলো অরুণের বিয়ে দিয়ে সংসারের চাবিকাঠি বৌমার হাতে তুলে দেবে। এই উদ্দেশ্যে অরুণকে একটু কাজ-কারবার শেখানোর জন্য তাকে মাঝে মাঝে দোকানে বসতে বলে।

কিন্তু তার ফল হয় বিপরীত, খুবই খারাপ। অরুণ এই সুযোগে ক্যাশ ভাঙতে আরম্ভ করে। ফলে, মাঝে মাঝেই মোটা টাকার হিসাবে গরমিল হতে থাকে।

লক্ষ্মণচন্দ্র সবই বুঝতে পারে। কিন্তু অরুণকে কিছুই বুঝতে দেয় না তাতে অরুণের সাহস আরও বেড়ে যায়। ক্যাশ ভাঙার ব্যাপারে তার দুঃসাহস আরও বাড়তে থাকে।

এক দুই করে লক্ষ্মণচন্দ্রের ছেলে বরুণের বয়স আট বছর হলো। দেখতে দেখতে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পেল।

এই বছর গরমের ছুটিতে বরুণ গেল রায়গঞ্জে, তার মাসীর বাড়িতে বেড়াতে।

লক্ষ্মণচন্দ্র কোনো রকমে দোকানটাকে টিকিয়ে রেখেছে। আর অরুণের কাছ থেকে কিল খেয়ে কিল চুরি করে চলেছে।

এদিকে আবার চলছে বিয়ের মরশুম। বায়নার পর বায়না আসছে। লাভের গুড় যদিও অরুণ নামক পিঁপড়েটি নিয়মিত খেয়ে যাচ্ছে, তাই বলে কাজকর্মের তো আর অভাব নেই।

এর মধ্যে আবার কুচবিহারের রাজবাড়িতে বিয়ের ধুম পড়লো।

বড় কুমারের বিয়ের দিনক্ষণ হঠাৎ ঠিক হয়ে গেল রাজাবাহাদুর একদিন লক্ষ্মণচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন। একটি হীরের নেকলেস নতুন ডিজাইনে তৈরি করতে হবে। আর তিনদিনের মধ্যেই তা করে দিতে হবে। লক্ষ্মণচন্দ্র চেষ্টা করলে পারবে, রাজাবাহাদুর তা জানতেন।

লক্ষ্মণচন্দ্র যদিও ওস্তাদ কারিগর, তবুও রাজবাড়ির গয়না গড়তে গেলেই ওর বুকটা একটু দুরুদুরু করে। তার ওপর হীরের নেকলেস। কম করেও তখনকার বাজারে দেড় লক্ষ টাকা দাম। কাজেই আহার নিদ্রা প্রায় ত্যাগ করে ও কাজে লেগে গেল। আর তিনদিনের জায়গায় দু'দিনেই কাজটা প্রায় শেষ করে ফেললো। বাকী থাকলো কেবল পালিশ। কিন্তু তার জন্যে চিন্তার কিছু নেই, হাতে যথেষ্ট সময় রয়েছে, তাই আজ রাত্তিরে নিশ্চিন্তে শুতে গিয়েছিল বিছানায়। আর শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ঘুমে একেবারে অচেতন হয়ে গিয়েছিল

হীরের নেকলেসটি ছিল লক্ষ্মণচন্দ্রেরই শয়নঘরে, একটি জবরদস্ত লোহার সিন্দুকের মধ্যে। আজকাল চুরি-ডাকাতি বেড়ে যাওয়াতে দোকানে আর কিছু রাখা চলে না। তাই গহনা-গাঁটি টাকা-পয়সা সবই বাড়িতে নিয়ে আসতে হয়। আর এ-সবই থাকে ওই সিন্দুকের মধ্যে। আজও আছে।

এই খবরটি অরুণের অজানা নয়। সে মতলবে আছে, অন্ততঃ হীরের নেকলেসটি আজ সরাবেই সরাবে। আর সরাতে হলে আজই হচ্ছে শেষ সুযোগ। কারণ কালই রাজবাড়িতে ফেরত দিতে হবে।

অরুণ মোটামুটি একটি প্ল্যানও করেছে। সে আর তার কাকা পাশাপাশি ঘরে শুয়ে থাকে। দুই ঘরের মাঝখানে আছে একটি দরোজা। দরোজাটি বরাবর বন্ধই থাকে। কাকার ঘরের দিকে আছে ছিটকিনি। আজ দিনের বেলাতেই সে সেটা খুলে রেখে এসেছে।

রাত প্রায় সাড়ে বারোটার সময় অরুণ মাঝের দরোজা দিয়ে কাকার ঘরে ঢোকে। কাকা তখন নাক ডাকাচ্ছে। অরুণ জানে,

ঘুমালেই কাকার নাক ডাকে। সিন্দুকের চাবিটা আছে কাকার বালিশের নীচে। অরুণ তাও জানে। বালিশের তলা থেকে চাবিটা বার করতে গিয়েই ধরা পড়ে যায় কাকার হাতে। সে হয়তো জানতো না ঘুমালেও কাকা কত সতর্ক থাকে।

অরুণ তখন আত্ম-পরিচয় না দিয়ে কাকার সঙ্গে ধস্তাধস্তি আরম্ভ করে। কাকাও নাছোড়বান্দা। আপ্রাণ যুঝে চলেছে। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে কাকার টুঁটি চেপে ধরে। তার দু'হাতের আঙুল কাকার কণ্ঠনালীর ওপর বসে যেতে থাকে। কাকাও দু'হাতে তাকে বাধা দিতে থাকে। আপ্রাণ শক্তিতে তার চুল টেনে ছিঁড়ে একাকার করতে থাকে। বলা বাহুল্য, ঘরটা এ-সময় ছিল অন্ধকার। কাকা বুঝতে পারে না, তার এই মরণপণ লড়াই চলছে তারই প্রাণাধিক ভাইপো অরুণের সঙ্গে। বুঝতে পারলে কী হতো বলা যায় না।

অরুণও হয়তো কাকাকে হত্যা করতে চায়নি। কিন্তু ঘটনার বিপাকে তাই-ই ঘটে গেল। লক্ষ্মণচন্দ্রের শরীরটা একটু কেঁপে উঠে একেবারে স্থির ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

অরুণ যখন বুঝতে পারলো কাকা মারা গেছে, সে তখন দেশ ছেড়ে পালানোই উচিত বলে মনে করলো। সিন্দুক খুলে সোনা-দানা, টাকা-পয়সা যা কিছু ছিল সবই একটি লেদার সুটকেশে ভর্তি করলো। তারপর সেই রাত্তিরেই চম্পট দিলো।

পরের দিন সকালে ঝি কাজ করতে এসে সর্বপ্রথম লক্ষ্মণচন্দ্রের মৃতদেহ দেখতে পায়। অরুণকে ডাকাডাকি করে, কিন্তু সাড়া পায় না। মাঝের দরোজাটি, যেটা এ-যাবৎ বন্ধ থাকতো, সেটাও খোলা দেখতে পায়। লোহার সিন্দুকটিও খোলা অবস্থায় তার নজরে পড়ে। চাবির গোছা মেঝেতেই পড়েছিল।

সে-ই প্রথমে পাড়ার লোকজনকে ডাকে, তারপর থানায় খবর দেওয়া হয়। রাজবাড়িতেও খবর চলে যায়।

রাজাবাহাদুর সেইদিনই প্রাইভেট ডিটেকটিভ গণেশ হালদারকে ট্রাঙ্ককল করেন। তিনি এই তদন্তের জন্য লক্ষ্মণচন্দ্রের হত্যাকারীকে

খুঁজে বার করার জন্য এবং হীরের নেকলেসটি উদ্ধার করার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিকে গণেশ হালদারকে নিয়োগ করেন।

গণেশ হালদার পরদিনই কলকাতা থেকে বিমানে কুচবিহার যায়। সঙ্গে সঙ্গে তদন্তও আরম্ভ করে।

খুবই সাধারণ একটি খুনের মামলা।

মাঝের দরোজার ছিটকিনিতে, চাবির গোছায় আর অরুণের ব্যবহার্য জিনিসপত্তরে একই হাতের ছাপ পাওয়া গেল। তাছাড়া মৃত লক্ষ্মণচন্দ্রের হাতের মুঠোয় যে চুল পাওয়া গেল, তার সঙ্গে অরুণের ব্যবহার্য চিরুনিতে পাওয়া চুলও হুবহু মিলে গেল। এই দুটি প্রমাণই ঘোষণা যে, অরুণই হচ্ছে লক্ষ্মণচন্দ্রের আততায়ী এবং হীরের নেকলেসটির অপহরণকারী।

কিন্তু কোথায় সেই অরুণ? খবরের কাগজে তার ছবি ছেপে বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো, পুরস্কার ঘোষণা করা হলো, কিন্তু কেউই তার হদিস দিতে পারলো না।

গণেশ হালদার নিজেও পুলিশের সাহায্যে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য বহু জায়গায় ঘুরলো, কিন্তু অরুণের টিকিটিরও সন্ধান করতে পারলো না। শেষ পর্যন্ত সে একরকম হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো।

তারপর এক এক করে সাত-সাতটি বছর কেটে গেছে। গণেশ হালদার অনেক মামলার অনেক রহস্য উদ্‌ঘাটন করেছে, কিন্তু এই মামলাটির কিনারাতেই আসতে পারেনি।

* * *

আজ গণেশ হালদারের ভাগ্য ভাল ছিল। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় গ্রহ মন্দিরের অফিসে এসে খোঁজ নিয়ে জানতে পারে যে, একজন দর্শনার্থী অনুপস্থিত আছে। কাজেই, গণেশ হালদার জ্যোতিষ সম্রাট গোপালাচার্যের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগটি অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই পেয়ে যায়।

সুধাংশু ভট্টাচার্য নামক কর্মচারীটিই এর পরের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রথমে গণেশ হালদারকে পনরো টাকা ফিস জমা

দিতে হলো। তারপর সুধাংশুবাবু একটি কার্ডে ও নাম ঠিকানা জন্ম-তারিখ ইত্যাদি লিখে নিয়ে সেটি জ্যোতিষ সম্রাটের চেম্বারে পৌঁছে দিলেন। একটু পরেই গণেশ হালদারের ডাক পড়লো।

গণেশ হালদার ঘরে ঢুকতেই জ্যোতিষ সম্রাট একটি চেয়ার দেখিয়ে ইঙ্গিতে ওকে বসতে বললেন।

'আমি এসেছি হাত দেখাতে।' বললো গণেশ।

'ডান হাতটি দিন।'

গণেশ জ্যোতিষীর সামনে টেবিলের ওপর হাত মেলে ধরলো। প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে হাতের রেখাগুলি তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। সব শেষে গুরু গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করলেন, 'শনিস্থান অত্যন্ত নিম্নগামী হয়েছে, আর মঙ্গল তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ফলে, মানসিক অশান্তি, অর্থ উপার্জনে বাধা এবং বাহিরের গণ্ডগোলের প্রবল সম্ভাবনা।' এই বলে তিনি থামলেন। গণেশ হালদারের মুখের দিকে তাকালেন।

গণেশ হালদার এই সুযোগে জ্যোতিষীর মুখখানি একবার সার্ভে করে নিল। নিজের হাতের দাগের প্রতি ওর কোনোই কৌতূহল ছিল না। ও দেখছিল, জ্যোতিষীর কপালের কাটা দাগটি। আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল তাঁর দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের মধ্যে কোনো জরুল চিহ্ন আছে কি না।

জ্যোতিষীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যেতেই গণেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। তারপরই বলে উঠলো, 'এর কি কোনো প্রতিবিধান নেই?

'আছে।' এই বলে জ্যোতিষী আবার গণেশের হাতের রেখার মধ্যে ডুবে গেলেন। কিছুক্ষণ বাদে বললেন, 'আমার বিচারে একটি ইন্দ্রনীল ধারণ করতে হবে।' বলেই তিনি প্যাডের কাগজে খসখস করে কয়েক লাইন লিখে কাগজটি গণেশের হাতে দিলেন।

নমস্কার করে গণেশ হালদার তাঁর চেম্বার থেকে বেরিয়ে এলো। যে উদ্দেশ্যে ও গোপাল আচার্যের চেম্বারে গিয়েছিল তা অনেকটা

সফল হয়েছে। নিজের হাত দেখানোর ছলে ওর দরকার ছিল গোপালাচার্যের হাতের ছাপ, যা এখন ওর সঙ্গেই রয়েছে, ব্যবস্থাপত্রটির মধ্যে। তাছাড়া হাতের লেখা তো রয়েছেই।

*　　*　　*

ফরেনসিক ডিপার্টমেণ্টের রিপোর্ট পেতে দেরি হলো না। অরুণ কর্মকারের হাতের ছাপের সঙ্গে গোপালাচার্যের হাতের ছাপ মিলে গেছে। আর এই মিলে যাওয়ার অর্থই হচ্ছে, ওরা দু'জনে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

বিশেষজ্ঞকে দিয়ে হাতের লেখাও পরীক্ষা করানো হয়েছে। অরুণের হাতের লেখার সঙ্গে গোপালাচার্যের হাতের লেখায় পুরোপুরি না হলেও অনেকটা মিল আছে। গণেশ হালদার তবুও গোপালাচার্যকে অ্যারেস্ট করতে চাইলো না। পেছনের বাকি ইতিহাসটুকু উদ্ধার করার জন্য ও উঠে পড়ে লাগলো।

খোঁজ-খবর নিয়ে ও জানতে পারলো যে, কাশীর একটি জ্যোতিষ-বিদ্যালয়ে গোপালাচার্য তিন বছর পড়াশুনো করেন। ভর্তি হন এখন থেকে সাত বছর আগে। সেখান থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করেন তিনি। এই সময় কিছু আমেরিকান পর্যটকের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাঁদের পরামর্শে তিনি আমেরিকায় গিয়ে সেখানকার একটি প্রখ্যাত জ্যোতিষ-মহাবিদ্যালয়ে এক বছর শিক্ষানবিশী করেন। সেখানেও তাঁর বহু লোকের সঙ্গে আলাপ হয়। অনেক শুভার্থীও জুটে যায়। তাদেরই কথামত তিনি কলকাতায় এসে অ্যাস্ট্রোলজির অফিসটি খুলে বসেন।

গণেশ হালদার আরও খোঁজ খবর নিতে থাকে। কিন্তু গোপালাচার্যের কাশীবাসের আগের কথা কিছুই জানতে পারে না। তা না পারলেও তার একটি ভয়ংকর ব্যাপার ও জেনে গেল। গোপালাচার্য কাশীতে থাকতেই একটি আন্তর্জাতিক স্মাগলিং পার্টির খপ্পরে পড়েন, যাদের হেড অফিস হচ্ছে খোদ আমেরিকায়। তারপর তাদেরই নির্দেশমত তাদেরই এজেণ্টরূপে তিনি এই কলকাতার

অফিসটি খোলেন। গ্রহ মন্দির আসলে হচ্ছে স্মাগলারদেরই অফিস, যদিও এর বাইরের রূপ অন্য রকম।

বছর দুয়েক আগে কালী টেম্পল রোডের ওপর একটা গোটা দোতলা বাড়ি গোপালাচার্য কিনে নেন। তখন থেকেই রাস্তার দিকের একতলার একটি ঘরে এনকোয়ারী অফিস এবং আর একটি ঘরে নিজের চেম্বার খুলে বসেন। আর বাইরের দিকে প্রকাণ্ড একটি সাইনবোর্ডে পিতলের হরফে লিখে দেওয়া হয়, 'গ্রহ-মন্দির'।

গণেশ হালদার হাত দেখানোর নাম করে অনেক লোককে পাঠিয়েছে। তাদের মারফত একটি গোপন ব্যাপার ও জানতে পেরেছে। স্বয়ং গোপালাচার্যের এবং আরও কিছু কিছু দর্শনার্থীর ডান হাতের তর্জনীতে কালো পাথর বসানো অদ্ভুত ধরনের আংটি আছে। এই আংটি হচ্ছে স্মাগলিং পার্টির সদস্যদের আইডেন্টিফিকেশন।

* * *

পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তরের বড়কর্তা সন্তোষ বিশ্বাস বরাবরই গণেশ হালদারকে স্নেহের চোখে দেখেন। অনেক মামলাতেই গণেশকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে কোনো ব্যাপারে পরামর্শ চেয়ে গণেশ কখনো বিমুখ হয়নি। এই মামলাটির ব্যাপারেও তিনি গণেশকে কার্যকরী পরামর্শ দিয়ে চলেছেন। গণেশ চায় গোপালাচার্যকে একটু খেলিয়ে ধরতে। সন্তোষবাবুও রাজী হয়েছেন। অবশ্য গোপালাচার্যকে ধরার জন্য পুলিশের জাল ইতিমধ্যেই পাতা হয়ে গেছে। তার পালাবার সব পথই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

* * *

লোক মারফত বরুণকে নিয়ে আসা হয়েছে কলকাতায়। তার একটি কোষ্ঠীও সংগ্রহ হয়েছে। এই কোষ্ঠীটি বিচার করানো হবে গোপালাচার্যকে দিয়ে। বরুণের সঙ্গে থাকবে গণেশ হালদার।

আগে থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে। কাজেই সাক্ষাতের কোনো অসুবিধা নেই।

এক মাসের মধ্যে গণেশ এই দ্বিতীয়বার গোপালাচার্যের সম্মুখীন হলো। বরুণকে দেখেই গোপালাচার্য যেন ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে গণেশ হালদারকে বললেন, 'কোষ্ঠী কার?'

গণেশ বললো, 'এই ছেলেটির।'

গোপালাচার্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোষ্ঠীর লেখাগুলো পড়লেন। তারপর গণেশ হালদারের মুখ থেকে বরুণের জীবনের দুঃসহ অবস্থার কথাও শুনলেন। অবশেষে তিনি মতামত দিলেন, 'জাতকের সাত বছর বয়সে রাহুর দশা এবং রাহুর অন্তর্দশা পড়ায় জাতক পিতৃহীন, সংসার ছিন্নভিন্ন। জাতক গৃহচ্যুত এবং পরের দানের ওপর নির্ভরশীল হয়েছে। রাহুই এর একমাত্র কারণ।'

গণেশ হালদার সবিনয়ে বললো, 'দয়া করে এর প্রতিকারের ব্যবস্থাটি যদি বলে দেন, ছেলেটির বড়ই উপকার হয়।'

গোপালাচার্য কী যেন ভাবলেন। তাঁর কপালে, চোখে, ঠোঁটে নানারকম ভাব-বৈচিত্র্য ফুটে উঠলো। একটু পরেই বলতে লাগলেন 'রাহুই হচ্ছে এই জাতকের একমাত্র শত্রু। অতএব একটি চার রতি ওজনের গোমেদ ধারণ অবশ্য কর্তব্য।' তারপর তিনি পেশাদারী হাতে প্যাডের কাগজে ব্যবস্থা-পত্র লিখে দিলেন।

গণেশ হালদার সযত্নে কাগজটি ভাঁজ করে পকেটে পুরে রেখে বললো, 'রাহুই তাহলে এর একমাত্র শত্রু?'

গোপালাচার্য বললেন, 'হ্যাঁ'। তাঁর গলাটা যেন একটু কেঁপে গেল।

'কিন্তু কে এই রাহু?' অনেকটা যেন আপন মনেই বলে উঠলো গণেশ হালদার।

'তার মানে?' এবার জ্যোতিষ-সম্রাট সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন।

'তার মানে, এই রাহু কি জাতকের জ্যাঠতুতো ভাই অরুণ কর্মকার, না কি…।'

'বলুন।'

'না কি জ্যোতিষ-সম্রাট গোপালাচার্য!'

'কী বলছেন যা তা? জানেন, কার সামনে বসে কথা বলছেন?'

'জানি। ডিটেকটিভ গণেশ হালদার সব কিছু জেনেশুনেই এখানে আজ এসেছে। আপনি যেমন হাতের রেখা বিচার করেন, আমিও তেমনি বিশেষ গুরুত্ব দিই এই হাতের রেখার ওপরেই। অবশ্যই দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। এর আগে যখন আমাকে প্যাডের কাগজে আমার ব্যবস্থা-পত্র লিখে দিয়েছিলেন, সেদিনই নিজের ব্যবস্থা-পত্রও সেইসঙ্গে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মনে পড়ছে?'

গোপালাচার্য এবার স্বমূর্তি ধরলেন। বললেন, 'বেরিয়ে যান এখান থেকে।'

গণেশ নির্ভয়ে বললো, 'যাবো। তবে আপনাকে নিয়ে যাবো। বাইরে পুলিশ-বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছেন টালিগঞ্জ থানার ও. সি. নিজে।'

গণেশের কথা শেষ হতে-না-হতে ও. সি. বিনয় মজুমদার দু'জন কনস্টেবল সহ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি গোপালার্যকে অ্যারেস্ট করার জন্য কনস্টেবল দু'জনকে নির্দেশ দিলেন।

গোপালাচার্য বললেন, 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ?'

'অভিযোগ দুটি। এক, আপনি নিজের কাকাকে খুন করে একটি হীরের নেকলেস নিয়ে পালিয়েছিলেন। আর দুই, ব্ল্যাক-মুন স্মাগলিং পার্টির এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন।' বললেন বিনয়বাবু।

'কোনো প্রমাণ আছে?'

'আছে। সে সব আদালতেই পেশ করা হবে। আপাততঃ আপনার এই আংটিটি খুলে রাখছি। যথা সময়ে এটি পেয়ে যাবেন।' এই বলে তিনি গোপালাচার্যের ডান হাতের তর্জনী থেকে কালো পাথর বসানো আংটিটি খুলে নিলেন।

* * *

গোপালাচার্য ওরফে অরুণ কর্মকার আদালতে নিজের পাপের কথা সবই স্বীকার করলো। তার জবানবন্দী থেকে জানা যায় যে, কাকাকে হত্যা করার ইচ্ছা তার ছিল না। কাকা যখন তার হাত চেপে ধরেছিল, তখন সে চেয়েছিল কাকার কাছে ধরা-চেনা না দিয়ে পালাতে।

আরও জানা গেল যে, কাকাকে খুন করার পর সেই রাত্তিরেই সে চলে যায় দূরবর্তী একটি গ্রামে। সেখান থেকে যায় জলপাইগুড়ি শহরে। সেখানে গিয়ে সে মাথা নেড়া করে ফেলে, গেরুয়া বেশ-বাস ধারণ করে। তারপর স্টেট বাসে চড়ে চলে যায় কলকাতায়।

কলকাতায় এসে নিজের কপালে নিজের হাতে চাকু দিয়ে সৃষ্টি করে একটি গভীর ক্ষতচিহ্ন। একটি নার্সিং-হোমে ভর্তি হয়ে থাকে প্রায় দু'মাসের ওপর।

এই সময় তার দাড়ি-গোঁফগুলো জঙ্গলের রূপ নিতে থাকে, আর তারই আড়ালে ঢাকা পড়ে যেতে থাকে তার বাঁ দিকের গালের ওপরের জরুল চিহ্নটি। এই দেখে দাড়ি গোঁফের ওপর তার ভীষণভাবে মায়া পড়ে যায়। সেই থেকে আর মুখের ওপর ক্ষুর চালায়নি কোনো দিন।

কলকাতা থেকে সে চলে যায় কাশীধামে। জ্যোতিষ-ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার মতলবটি সে কলকাতার নার্সিং-হোমে শুয়ে শুয়েই বার করেছিল। নিজের ভবিষ্যৎ জীবনটিকে কোন্ খাতে বইয়ে দেবে, তা তখনই সে ঠিক করে ফেলেছিল। তখন অবশ্য ভাবতে পারেনি কোনো দিন যে 'ব্ল্যাক মুন' নামক স্মাগলিং পার্টির খপ্পরে পড়বে, কিংবা তাদের এজেন্টরূপে কাজ করতে থাকবে।

অরুণের আর সব কথা তো আগেই বলা হয়েছে।

এই মামলাটি থেকে গণেশ হালদার একটি মূল্যবান শিক্ষা পেল, তা হচ্ছে খুনী যত চালাকই হোক না কেন, যেভাবেই সে গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, ডিটেক্টিভ চেষ্টা করলেই একদিন না একদিন তাকে ধরতে পারে।

আবার সেই জঙ্গলকাঁপানো হুঙ্কার। পরপর দু'বার। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল ছাড়া এ রকম ভয়ঙ্কর গলার আওয়াজ আর কোন্ বনের রাজারই বা আছে!

অবশ্য বনের রাজাদের ব্যাপার-স্যাপার গণেশ হালদারের জানার কথা না। চিড়িয়াখানা ছাড়া আর কোথাও তাদের সাথে ওর মোলাকাতও হয়নি। তবুও শিকারের, অ্যাডভেঞ্চারের বই-টই পড়ে বিভিন্ন পশুরাজদের গর্জন সম্বন্ধে ওর মনে যে-সব ধারণা গড়ে উঠেছিল, এই মুহূর্তে সে-সব একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। আর, ও বেশ ভয়ও পেল।

ভয় পাওয়াটা নিঃসন্দেহে গণেশ হালদারের চরিত্রের একটি বড় দুর্বলতা। এ রকম দুর্বলতা থাকলে কেউ বড় ধরনের ডিটেকটিভ হতে পারে না। অতএব গণেশ হালদারের ভবিষ্যৎ যে খুব উজ্জ্বল নয়, একথা আর পাঁচজনও যেমন জানে, গণেশ হালদার নিজেও তেমনি জানে। তবুও বিপদে পড়লে লোকে ওকে ডাকে, ও-ও আপ্রাণ চেষ্টা করে বিপদগ্রস্ত লোককে বিপদ থেকে মুক্ত করতে। এই যেমন এবারের কথাটাই ধরা যাক না, এবার ও এসেছে সুন্দরবন এলাকার এই মাতোয়া গ্রামের বাসিন্দাদের ডাকে সাড়া দিয়ে।

মাতোয়া গ্রামের বাসিন্দারা নিজেরা অবশ্য গণেশ হালদারকে ডাকেনি। কারণ তারা প্রাইভেট ডিটেকটিভ গণেশ হালদারের নামই কখনো শোনেনি। তা ছাড়া বাঘের উপদ্রবের সময় একজন ডিটেক-টিভের কী করণীয় থাকতে পারে, তাও তারা জানে না। তারা চেয়েছিল একজন জবরদস্ত শিকারীকে আনবে। ফরেস্ট অফিসার নিরঞ্জন সিংহকে তারা শিকারী আনার জন্যই বলেছিল। কিন্তু নিরঞ্জন সিংহ শিকারীর পরিবর্তে আনালো একজন গোয়েন্দাকে।

নিরঞ্জন সিংহ নিজেই তো সিংহের মতন দুর্ধর্ষ! একটা বাঘকে ঘায়েল করা ওর কাছে কোনো ব্যাপারই নয়। ও একাই হচ্ছে একশো—একশোটা শিকারীর কাজ ও প্রায় একাই করতে পারে, এ-বিশ্বাস ওঁর আছে। ও বুঝে নিয়েছে, মাতোয়া গ্রামের 'মানুষ-খেকো'টির আচরণ বেশ রহস্যজনক। এ-রহস্য ভেদ করা ওর বা কোনো শিকারীর 'কম্ম' নয়। ও আরও বুঝে নিয়েছে, মাতোয়া গ্রামের দু'-দু'টি তাজা জোয়ান প্রাণ দিয়েছে বাঘের চেয়েও হিংস্র ধূর্ত কোনো জন্তুর থাবায়। বুঝবেই তো! ওর মতন পাকা শিকারী আমাদের দেশে এখন আর ক'জনই বা আছে?

নিরঞ্জন সিংহ নিজের এই উপলব্ধির কথা মাতোয়া গ্রামের বাসিন্দাদের জানায়নি। এমন কি পুলিশকেও কিছু খুলে বলেনি। আর বললেও কতটা লাভ হ'তো, সে বিষয়ে ওর যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাই নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই কলকাতা থেকে ডেকে এনেছে প্রিয়বন্ধু গণেশ হালদারকে। লোক মারফতেই ডেকে এনেছে।

গণেশ হালদারেরও অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল সুন্দরবন দেখার। তাই সুযোগটাকে ও হাতছাড়া করেনি। হাতের জরুরী কাজগুলোকে আপাততঃ চাপা দিয়ে রেখে আজই ও মৌবনে এসেছে। কলকাতা থেকে ক্যানিং পর্যন্ত ট্রেনে, তারপর সেখান থেকে বনবিভাগের লঞ্চে চেপে মৌবনের এই বাংলোয় এসে উঠেছে।

এই বাংলোটি আসলে নিরঞ্জন সিংহের ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স। ফণী নদীর ধারেই এর অবস্থান। ওর অফিসটির অবস্থানও এই ফণী নদীর ধারেই। বাংলো থেকে মাত্তর ছ'সাতশো গজ দূরে। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। অন্য স্টাফ কোয়ার্টার্সগুলোও দূরে নয়। বাংলোটিরই ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

তখন অঘ্রাণ মাস। হিমেল হাওয়া সুন্দরবনের চৌহদ্দির মধ্যে এসেই যেন 'হিম' হারিয়ে ফেলেছে। শীতের অতিথি-পাখিরাও এখনো এখানে ঝাঁকের সংখ্যা বাড়িয়ে জাঁকিয়ে বসতে পারেনি। তবে ট্যুরিস্টরা বেশ আসতে আরম্ভ করেছে। আগে এ-সময় থেকেই

শিকারীরা আসতে শুরু করতো। এখন সেই শিকারীদের পরিবর্তে আসছে ট্যুরিস্টরা।

রাত এখনো বেশী হয়নি। সবে সাড়ে ন'টা। রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়ার পর নিরঞ্জন সিংহের সঙ্গে আলোচনা চলছিল গণেশ হালদারের। মাতোয়া গ্রামের রয়্যাল বেঙ্গল রহস্যই ছিল তাদের আলোচ্য বিষয়। সবে আলোচনাটা আরম্ভ করেছে ওরা। বিশ মিনিটও চলেনি। এরই মধ্যে এবার নিয়ে তু'বার বাঘের গর্জনে তা ব্যাহত হ'লো।

নিরঞ্জন সিংহ বললো, 'বাঘটা এখান থেকে অনেক দূরে আছে। হয়তো কেউ তার মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিয়েছে। তাই ও রকম রেগে গেছে সে।'

গণেশ হালদার সবিস্ময়ে বললো, 'এই রাত্তির বেলা এখানে বাঘের মুখের গ্রাস ছিনিয়ে নিতে আসবে, এমন সাহস কার আছে?'

'শুধু মানুষেরই আছে।'

'মানুষের!'

'হ্যাঁ, মানুষের। সুন্দরবনের মানুষ হচ্ছে বাঘের চেয়েও ধূর্ত, বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর।'

গণেশ হালদার নিরঞ্জন সিংহের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, অবাক হয়েই।

'ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছি, শোন। বাঘের মাছ ধরার গল্প শুনেছ তো। বাঘ নদীতে ডুব-সাঁতার দিয়ে মাছ ধরে। ছোটখাটো নয়, খুব বড় বড় মাছ। সেই মাছ একটা একটা করে ধরে, আর মেরে মেরে ডাঙায় ফেলে দেয়। এ-ভাবে মাছ ধরতে ধরতে সে তু-তিন মাইল পর্যন্ত চলে যায়। বাঘের এই মাছ ধরা দৈবাৎ জেলেদের নজরে পড়ে গেলে তারা সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে সরে পড়ে। ওদিকে ফিরতি পথে বাঘের কাজ হচ্ছে মাছগুলো খেতে খেতে আসা। যে জায়গা থেকে সে মাছ ধরতে আরম্ভ করেছিল, ঠিক সেই জায়গা পর্যন্ত সে আসবে। এর মধ্যে সে যদি দেখে তার ধরা মাছ কেউ কুড়িয়ে

নিয়ে গেছে, তাহলে সে ভয়ানক রেগে যায়। সাধারণতঃ জ্যোৎস্না রাত্তিরেই এ রকম ঘটনা ঘটে। আজও তো হচ্ছে জ্যোৎস্না রাত। বলা যায় না, জেলেরা বাঘটির মুখের খাবার এ-ভাবে কেড়ে নিতেও পারে।'

'বাঘের মাছ ধরার কথা এই প্রথম শুনলাম। শুনেছি, সুন্দরবনের নদীতে খুব কুমীর আছে। বাঘ জলে নামলে কুমীরের সঙ্গে তার লড়াই বাধে না?'

'হ্যাঁ, তাও সময় সময় বাধে। বাঘ আর কুমীরের লড়াই নিয়ে এ-অঞ্চলে অনেক গল্পই ছড়িয়ে আছে। সে-সব পরে শুনবে। এখন আবার মাতোয়ার কথায় ফিবে যাওয়া যাক। কী যেন জিজ্ঞেস করছিলে তখন?'

'মাতোয়া গ্রামটা এখান থেকে কদ্দূর?'

'মাইল পাঁচেক হবে। এই ফণী নদীর উত্তর পাড়েই। লঞ্চে মাত্র বিশ-পনরো মিনিটের পথ।'

'তা হলে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে এ রকম: গত চৌঠা নভেম্বর অনিল আর সুনীল গিয়েছিল কাঠ কাটতে। তারা হচ্ছে আপন ভাই। মাতোয়া গ্রামেই তাদের বাস পুরুষানুক্রমে। রাম-লক্ষ্মণের মতন যেমনি তাদের ভাব ছিল, তেমনি সাহস আর শক্তিও ছিল। যা হোক, তারা গিয়েছিল ফণী নদীতে নৌকা ভাসিয়ে কাঠ কাটতে। সকাল আটটার সময়। সারা দিন ধরে কাঠ কেটে কাঠের সাইজ করা টুকরোগুলো নৌকার ওপর সাজিয়েও ফেলেছিল। তারপর স্রোতের টানের ওপর নৌকাটাকে ছেড়ে দিয়ে অনিল হুঁকো টানছিল, আর সুনীল খোলের মধ্যে সাজানো কাঠের দুর্গের মধ্যে বসে নৌকার জল ছেঁচছিল। সে-সময় হঠাৎ একটা রয়্যাল বেঙ্গল লাফিয়ে পড়লো ডাঙা থেকে, অনিলকে লক্ষ্য করে। কিন্তু সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়লো গিয়ে সাজানো কাঠের ওপর। নৌকাটা অসম্ভব টলে গেল। অনিল হুঁকো-কল্কে সমেত ছিটকে পড়লো ফণী নদীর জলে। তারপর সাঁতরে উঠলো ডাঙায়। সে চিৎকার করতে করতে নৌকাটাকে ফলো

করে চললো। আর ওদিকে রয়্যাল বেঙ্গল মশাই দেহের ভারে কাঠের দুর্ভেদ্য দুর্গটিকে সামান্য ধ্বসিয়ে দিলেন। তাঁর পিছনের পা দু'খানি কাঠের ফাঁক দিয়ে খোলের ভেতর ঢুকে গেল। এ সময় তাঁর নজর পড়লো সুনীলের ওপর। তিনি অনেক চেষ্টা করলেন কাঠ সরিয়ে সুনীলকে ধরার। কিন্তু পারলেন না। তাঁর তখন ভয়ানক রোখ চেপে গেল। সামনের দুটো থাবা দিয়ে কাঠের দুর্গটাকে চুরমার করে দিতে চাইলেন। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। তাঁর পেছনের পা দু'খানি খোলের ভেতর আরও বসে গেল। ওদিকে সুনীলও তখন চুপ করে বসে ছিল না। সে তখন খুব মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বাঘের লালা তার গায়ে পড়তেই সে জীবনের আশা এক রকম ছেড়েই দিয়েছিল। কিন্তু সাহস আর বুদ্ধি হারায়নি। খোলের ভেতর থেকে শনের তৈরি মোটা একটা দড়ি সে তুলে নিল। দড়িটার একটা মাথা বাঁধলো নৌকার একটা পাটার সঙ্গে। বেশ শক্ত করে বাঁধলো। তারপর দড়িটার আর এক মাথায় তৈরি করলো জোড়া ফাঁস। ফাঁসটা পরিয়ে দিল রয়্যাল বেঙ্গলজীর পেছনের দু'টি পায়ে। দুধ দোয়ার সময় গরুকে যেভাবে পেছনের পা দু'টোয় দড়ির ফাঁস পরিয়ে ছাদা হয়, রয়্যাল বেঙ্গলজীকেও সুনীল সেভাবে ছেদে দিল। তারপর পেছনের পায়ে দড়ির টান পড়তেই মহারাজ দিলেন একটি উল্টো লাফ। ঝপাং করে পড়লেন গিয়ে ফণী নদীর জলে। এদিকে তখন অনিলের হাঁকডাকে বহু লোক জড় হয়ে গেছে। সবাই সশস্ত্র। সবাই মিলে বাঘটাকে আধমরা অবস্থায় বন্দী করে ফেললো। এই তো ?'

'বাঃ, তুমি দেখছি আমার চেয়েও ভাল করে বললে।'

'আমার চেয়েও ভাল করে বলেছে খবরের কাগজের রিপোর্টাররা। বাঘবন্দীর খবর অনিল-সুনীলের ছবিটবি দিয়ে বেশ ক'দিন ধরে ছাপিয়েছে। এখন তো চিড়িয়াখানায় সেই বন্দী মহারাজকে দেখার জন্য লম্বা লম্বা লাইন পড়ছে, আলাদা দর্শনীও দিতে হচ্ছে।'

'দুঃখের বিষয়, সেই অনিল-সুনীলই আজ আর নেই! বাঘের বাঘিনী নাকি তাদের মেরে প্রতিশোধ নিয়েছে!'

'অনিল-সুনীল মারা গিয়েছে উনিশে নভেম্বর। তাই না?'

'হ্যাঁ, ঠিক পনরো দিনের মাথায় বাঘিনী তাদের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে বলে চারদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে। তোমার কাজ হচ্ছে সে আসলে বাঘিনী, না বাঘ, তা খুঁজে দেখা। আরও খুঁজে দেখতে হবে তোমাকে, সে আসলে বাঘের চেয়েও কোনো ভয়ঙ্কর জন্তু কি না।'

'বাঘের ব্যাপার আমার চেয়ে তুমিই ভাল বুঝবে। তুমি তো স্পটে গিয়েছিলে। তোমার অবজারভেশনটাই আগে শোনা যাক।'

'গত উনিশ তারিখে অনিল আর সুনীল নৌকায় চড়ে আবার কাঠ কাটতে গিয়েছিল। কিছু কাঠও কেটেছিল। কিন্তু সেগুলো আর নৌকায় তোলার অবসর পায়নি। হঠাৎ তারা উধাও হয়ে যায়। যেখানে কাঠের খণ্ডগুলো পড়ে ছিল, সেখানে অবশ্য প্রচুর রক্তপাত হয়েছিল। নরম মাটির ওপর বাঘের পায়ের ছাপও পাওয়া গেছে। এই পায়ের ছাপ দেখে লোকের ধারণা হয়েছে, বাঘই অনিল-সুনীলকে মুখে করে গভীর জঙ্গলের দিকে নিয়ে গেছে। তখন জোর খোঁজাখুঁজি শুরু হয় তাদের লাশগুলো পাওয়ার জন্য। আজ নিয়ে পাঁচদিন ধরে খোঁজাখুঁজি হ'লো, কিন্তু কোথাও তাদের লাশগুলো পাওয়া গেল না।'

'বাঘ হয়তো তাদের খেয়ে ফেলেছে।' হাল্‌কাভাবে বললো গণেশ হালদার।

'এটা কি ডিটেক্‌টিভের মতন কথা হ'লো! বাঘ তাদের খেয়ে ফেললে হাড়গুলো যাবে কোথায়? জলে নিশ্চয়ই ভাসিয়ে দেয়নি বাঘ! তা ছাড়া একই সঙ্গে দু'জন মানুষকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও কোনো বাঘের নেই।' একটু থেমে নিরঞ্জন সিংহ আবার বললো, 'দূরে যারা কাঠ কাটছিল তারা অবশ্য বাঘের গর্জন শুনেছিল। কিন্তু তার কিছুক্ষণ আগে পরপর দু'বার গুলির আওয়াজও শুনেছিল।

কাঠুরেরা ভেবেছিল, কোনো শিকারী হয়তো বাঘ মেরেছে। একটা আপদ কমেছে ভেবে তারা আরও উৎসাহের সঙ্গে কাঠ কাটতে আরম্ভ করেছিল। ওই কাঠুরেরা যেখানে কাঠ কাটছিল, অনিলদের সেখানে গিয়ে মিট করার কথা ছিল, সন্ধ্যের আগেই। সন্ধ্যে উত্‌রে যাওয়ার পরেও যখন অনিলরা এলো না, তখন তারা খোঁজখবর নেওয়ার জন্য নৌকা নিয়ে ভেতরের দিকে ঢুকে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তারা খালি নৌকাটা, সদ্যকাটা কিছু কাঠ, বাঘের পায়ের ছাপ আর রক্তের দাগ আবিষ্কার করে। হাঁকডাক, খোঁজাখুঁজি তখন থেকেই আরম্ভ হয়। তারা ধরে নিয়েছিল গোড়ার দিকে, অনিল আর স্থনীলের মধ্যে একজন বেঁচে আছেই, আর সে ভয়ে হয়তো কোনো গাছের ডালে উঠে বসে আছে। কিন্তু হাজার ডাকাডাকিতেও যখন কারোরই পাত্তা পাওয়া গেল না, তখন তারা ধরে নিল ত্ব'জনেই বড় শিয়ালের পেটে গেছে।'

'অনিল-স্থনীলের কে আছে?'

'বাপ-মা নেই। তবে ত্ব'জনেরই বৌ-ছেলেমেয়ে আছে।'

'জমি-জতি কিছু আছে?'

'খারাপ নেই, কিন্তু সবটাই ডিসপুটেড। তাদের পঁচিশ বিঘে জমিই নাকি বলাই পালের কাছ থেকে জবর-দখল করে নেওয়া।'

'বলাই পাল কে?'

'মাতোয়ারা গ্রামের সবচেয়ে বড় জোতদার। তা ছাড়া তিনি আবার এখানকার অঞ্চলে পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট।'

'তাই নাকি!'

'হ্যাঁ। খুবই সাহসী লোক এই বলাই পাল। এক সময় সার্কাসে খেলা দেখাতেন। বাঘের খেলা। আজ প্রায় পনরো বছর হ'লো চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে এসেছেন। এখন চাষবাস দেখেন। তাছাড়া ফরেস্টের কনট্রাকটরীও করেন। অবস্থা বিরাট। শুনেছি, বাড়িতে তিনি নাকি একটা বাঘ পুষেছেন।'

'কুকুর না পুষে বাঘ পোষা! কী সাংঘাতিক!'

'সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক। কাল সকালে তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেই বুঝতে পারবে তিনি কী চিজ!' এর পরই প্রসঙ্গ পালটে নিরঞ্জন সিংহ বললো, 'আচ্ছা, গুড নাইট। রাত অনেক হ'লো, তুমি এখন ঘুমোও?' বলেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গণেশ হালদার ঘরের দরোজাটা বন্ধ করে দিয়ে পরপর চার টিপ নস্যি টানলো। তারপর আরও চার টিপ। নস্যি টানার পর শুয়ে পড়ে ঘুমানোর চেষ্টা করলো ও। কিন্তু ওর ঘুম আসতে প্রায় আধঘণ্টা দেরি হ'লো। এই আধঘণ্টা ধরে ও কল্পনা করতে লাগলো বলাই-বলাই মুখ, যিনি কুকুরের পরিবর্তে বাড়িতে পুষে রেখেছেন একটি বাঘ। আর কী আশ্চর্য, এই আধঘণ্টার মধ্যে চিড়িয়াখানায় সভ্য ধরে আনা একটি বাঘের মুখ ছাড়া অন্য কোনো মুখ ওর মনের পর্দায় একবারও ভেসে উঠলো না। আরও আশ্চর্য, এই বাঘটাই গত চৌঠা নভেম্বর বন্দী হয়েছিল অনিল আর সুনীলের প্রখর উপস্থিত বুদ্ধির ফলে, সুন্দরবনের এই এলাকাতেই!

ভোরবেলা পাখির ডাকে ঘুম ভাঙলো গণেশ হালদারের। পাখির ডাক তো নয়, যেন তাদের জাতীয় সঙ্গীত!'

চা খাওয়ার সময় নিরঞ্জন সিংহ বললো যে, আটটার মধ্যেই বেরোতে হবে। লোকজন লঞ্চের ওপর তৈরী হয়েই থাকবে।

আটটার মধ্যেই ওরা রওনা হ'লো লঞ্চে চড়ে। ফণী নদীর ওপর দিয়ে লঞ্চ ছুটে চললো পূবদিকে। আঠারো মিনিটের মাথায় ওরা মাতোয়া গ্রামের ঘাটে এলো।

গণেশ হালদার বললো, 'আগে স্পটটা দেখে আসা যাক। ফেরার পথে মাতোয়ায় নামবো।'

কাজেই লঞ্চ আরও পূবদিকে ছুটে চললো, ফণী নদীর আঁকাবাঁকা পথ ধরে।

বন এখানে গভীর। সুন্দরী, গরান, কেওড়া প্রভৃতি গাছের ছিমছাম বন। গোলপাতা গাছও মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। বনের

ওপরটায় গাছেদের ঝাঁকড়া ডালপালা, কিন্তু নীচেটা বেশ পরিষ্কার। অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

নদীর দু'ধারে হোগলা আর পাতি ঘাসের জঙ্গল। দু'-তিনটে কচ্ছপ সেখানে লুকিয়ে ছিল। লঞ্চটা কাছে আসতেই তারা ঝুপ ঝুপ করে জলে নেমে পড়লো। আরও দূরে, পাড়ের ওপর একটা কুমীর রোদ পোয়াচ্ছিল। সে-ও লঞ্চের শব্দে অস্থির হয়ে জলে নেমে এলো। লঞ্চটা আরও কিছুটা যাওয়ার পর দেখা গেল, বনটা বেশ পাতলা হ'য়ে গেছে। দু'ধারে শুধু নলবন। গণেশ হালদার শুনেছিল, এরকম নলবনেই বাঘ থাকে।

আবার বন ঘন হতে আরম্ভ করলো। এ-সময় একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গেল। একটা বাঁদর আর একটা বাঁদরকে আচ্ছা করে কাদা মাখাচ্ছে। গণেশ হালদার ভাবলো, এটা বুঝি বাঁদরদের এক রকমের স্পোর্টস। কিন্তু নিরঞ্জন বললো, 'যে বাঁদরটাকে কাদা মাখানো হচ্ছে ও একটু পরেই কোনো গাছে উঠে মধু খাবে। মধু খাওয়ার সময় বাঁদররা ও রকম কাদা মাখে। গায়ে কাদা মাখা থাকলে মৌমাছির হুল খেতে হয় না।'

'ওদের তো খুব বুদ্ধি!'

'বুদ্ধি তো থাকবেই। হাজার হলেও ওরাই তো আমাদের পূর্বপুরুষ!' বলেই নিরঞ্জন সিংহ কিছু একটা শোনার জন্য অল্পক্ষণ কান পেতে রইলো। তারপর বললো, না, ও হরিণের ডাক নয়।'

আরও এগিয়ে চললো লঞ্চ। নদীর একটি বাঁকের মুখে এসে নিরঞ্জন সিংহ আঙুল নেড়ে নেড়ে গণেশ হালদারকে বললো, 'অনিল-সুনীল যেদিন 'নো-ট্রেস' হয় সেদিন ওদের গ্রামের কাঠুরেরা এই দক্ষিণ পাড়ে নৌকা ভিড়িয়ে ভেতরে কাঠ কাটছিল।'

গণেশ হালদার জায়গাটা দেখে নিল। কিন্তু লঞ্চ থামাতে বললো না। লঞ্চের ওপর থেকেই দেখলো। এ-সময় এক ঝাঁক টিয়া ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

প্রায় মিনিট আষ্টেক বাদে লঞ্চ নদীর দক্ষিণ পাড়ে থামলো। নিরঞ্জন সিংহ ও গণেশ হালদার নেমে এলো ডাঙায়।

ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটি। একটু যেন এঁটেল-এঁটেল। দু'জনেই চললো ভেতর দিকে। দেখে দেখে পা ফেলতে হচ্ছে ওদের। কেননা, মাঝে মাঝেই সুন্দরী গাছের শক্ত শেকড়গুলো মাটি থেকে ওপরের দিকে পেরেকের মতন হাঁ করে বেরিয়ে রয়েছে। স্থানীয় লোকেরা এই শেকড়গুলোকে বলে হুলুয়া বা কেওড়া মুলো। খালি পায়ে এ-সব মাটিতে হাঁটাই মুশকিল। তবে নিরঞ্জন সিংহ বা গণেশ হালদারের সে অসুবিধা নেই। ওদের পায়ে রয়েছে গামবুট। গণেশ হালদারের নিজস্ব গামবুট নেই। নিরঞ্জন সিংহের বাড়তি একজোড়া ও পরে নিয়েছে।

হঠাৎ একটু দূরে শোনা গেল 'কুহ্-কুহ্' শব্দ। একটা কেওড়া গাছে বসে একদল বাঁদর ফল খাচ্ছে আর এইরকম অদ্ভুত শব্দ করছে।

নিরঞ্জন সিংহ হঠাৎ গণেশ হালদারের একটা হাত ধরে টানতে টানতে একটা গরান গাছের গুঁড়ির আড়ালে নিয়ে এলো। তারপর ফিসফিস করে বললো, 'একটু পরেই মজাটা দেখতে পাবে।' বলেই চুপ করে গেল।

দু'জনেই নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দেখা গেল, এক পাল হরিণ কোত্থেকে ছুটে এলো ঠিক ওই বাঁদরদেরই মতন 'কুহ্-কুহ্' শব্দ করতে করতে। বাঁদরগুলো তখন ওপর থেকে কেওড়া ফল আর পাতা ফেলে দিতে লাগলো নীচে। হরিণরা সেগুলো খেতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে তারা কান খাড়া করে এদিকে-ওদিকে তাকাতে লাগলো। তারপর একসঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের গভীরে।

নিরঞ্জন সিংহ ও গণেশ হালদার গরান গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে লাগলো। হাঁটতে হাঁটতেই নিরঞ্জন সিংহ বললো, 'বাঁদর আর হরিণের মধ্যে আছে দারুণ মিতালি। বাঘ

দেখলেই বাঁদররা 'হুপ-হুপ' করে চিৎকার করে হরিণদের সাবধান করে দেয়। আবার অন্য সময় 'কুহ্-কুহ্' করে হরিণদের ডেকে এনে ফল আর পাতা খাওয়ায়। এই 'কুহ্-কুহ্' হচ্ছে আসলে হরিণদেরই ডাক। বাঁদররা নকল করে ডাকে।'

'বাঁদররা তো বেশ চমৎকার নকল করে!'

'শুধু বাঁদররা কেন, শিকারীরাও নকল করে। তারা বাঁদরদের মতন করে হরিণদের ডেকে আনে। কিন্তু খাদ্যের পরিবর্তে ছুঁড়ে দেয় কেবল প্রাণভেদী গুলি। নিরীহ হরিণরা এভাবে নিহত হয় ছদ্মবেশী মিতেদের হাতে!'

কথায় কথায় ওরা উপস্থিত হ'লো অকুস্থানে। এখনো সেখানে কাঠগুলো কাটা রয়েছে। তবে রক্তের দাগ প্রায় অস্পষ্ট হয়েই গেছে। অবশ্য বাঘের থাবাগুলো সে তুলনায় বেশ স্পষ্ট রয়েছে। পেছনের পা দুটোয় পাঁচটি করে নখের অস্তিত্ব ভালই বোঝা যাচ্ছে। পেছনের পায়ে চারটির পরিবর্তে পাঁচটি করে নখ! এটা বেশ অস্বাভাবিক বলেই মনে হলো গণেশ হালদারের কাছে।

বাঘটির আসা-যাওয়ার পায়ের থাবাগুলো বেশ খতিয়েই দেখলো গণেশ হালদার। দূরত্বে বা গভীরতায় খুব একটা পার্থক্য নেই। প্রায় একই রকম মনে হ'লো ওর কাছে। এই সঙ্গে আরও অনেক পায়ের ছাপ লক্ষ্য করলো ও। সে-সব মানুষের পায়ের। পায়ের ছাপগুলো ধরে বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর গণেশ হালদারের মনে হ'লো, বাঘটা যেন একটা জুতোপরা মানুষকে অনুসরণ করে অকুস্থানে এসেছে, আবার ফিরে গেছে। এই জুতোপরা মানুষটার চলাটা একটু অস্বাভাবিক। কেননা, তার দু'পায়ের ছাপ কোথাও সমানভাবে পড়েনি। মোট দুটো অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করলো গণেশ হালদার। সত্যিই অস্বাভাবিক।

গণেশ হালদার বললো, 'যা দেখার দেখে নিয়েছি। এখন চল বলাই পালের আস্তানায়।'

লঞ্চে ফেরার সময় সামান্য ঘুর-পথে এলো ওরা। নদীর কাছাকাছি-

আসতেই দেখে এক অদ্ভুত দৃশ্য। ওরা চুপ করে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখলো।

নদীটা এখানে বেশ সংকীর্ণ। ওপারের একটি গাছের ডালে শিকলের মতন ঝুলে রয়েছে তিনটি বাঁদর। ওপরের বাঁদরটা ধরে রয়েছে গরান গাছের একটি ডাল। মাঝেরটা ধরেছে তার পেছনের দুটো পা। আর সবচেয়ে নীচেরটা ধরে রয়েছে মাঝখানের বাঁদরটার পেছনের পা দুখানি। এভাবে তারা দোল খাচ্ছে। আরও একটা বাঁদর এসে নীচেরটার পেছনের পা দুটো ধরে দোল খেতে লাগলো। তারপর সবাই মিলে দোল খেতে লাগলো ওইভাবে। দোল খেতে খেতেই নীচেরটা ধরে ফেললো এপারের একটি সুন্দরী গাছের ডাল। আর সঙ্গে সঙ্গে নদীর ওপর একটা সেতু তৈরি হয়ে গেল। দলের আর সব বাঁদর তখন সেই সেতুর ওপর দিয়ে নদীটা পার হয়ে এলো। অবশেষে ও-পারের এক নম্বর বাঁদরটা গাছের ডালটা ছেড়ে দিতেই সেতুটা এপারে ঝুলে এলো। এ-ভাবে সবাই নদীটা পার হয়ে এলো।

নিরঞ্জন সিংহ ও গণেশ হালদার সামান্য দিক পরিবর্তন করে লঞ্চে এসে উঠলো। লঞ্চ সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিল।

মাতোয়া গ্রামের ঘাটে লঞ্চটাকে ভিড়িয়ে রেখে ওরা দুজনে সটান চলে এলো বলাই পালের বাড়িতে। বলাই পালের সঙ্গে নিরঞ্জন সিংহের আগেই একবার এই জোড়া খুন নিয়ে মোলাকাত হয়ে গেছে। তাছাড়া নিরঞ্জন সিংহের কাছে বলাই পাল ফরেস্টের কনট্রাক্টর হিসাবেও বিশেষ পরিচিত। তাই তিনি ওকে দেখেই বলে উঠলেন, 'আসুন আসুন স্যার। সঙ্গে ইনি কে?'

ইনি হচ্ছেন পুলিশের গোয়েন্দা। কলকাতা থেকে এসেছেন। নাম হচ্ছে বলহরি ঘোষাল। ঘ্রাণশক্তির জন্য বিখ্যাত। আর উনি হচ্ছেন এখানকার অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট মিস্টার বলাইচন্দ্র পাল।

বলহরি ঘোষাল ওরফে গণেশ হালদার ও বলাই পালের মধ্যে নমস্কার বিনিময় হলো। এই সময়টুকুর মধ্যেই গণেশ হালদার বলাই পালের চেহারাটা মোটামুটি জরীপ করে নিল।

বলাই পালের উচ্চতা ছ'ফুটের সামান্য কম। সে-অনুপাতে শরীরটা রোগা। কিন্তু পেশীগুলো বেশ শক্ত আছে। যেন দড়ির মত পাকানো। গায়ের রঙটা শ্যামবর্ণ, একটু যেন পোড়া-পোড়া। মুখটাও যেন পোড়-খাওয়া। মোটা নাকটার তুলনায় চোখ দুটো খুবই ছোট কুতকুতে। কানের পাতা দুটো বেঁকে একটু সামনের দিকে এসেছে। তবে সবচেয়ে বিশ্রী হচ্ছে তাঁর বিরাট বিশাল টাক যেন ধু-ধু সাহারা।

গণেশ হালদার বললো, 'আমি এসেছিলাম রয়্যাল বেঙ্গল রহস্যের তদন্ত করতে। অনিল-সুনীলের মৃত্যুর ব্যাপারটা কনফারম না হওয়া পর্যন্ত এ রহস্য উদ্ঘাটন হবে না। তবে আপনার সাহায্য আমাদের হয়তো একটু-আধটু দরকার হতে পারে।'

'আরে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সে-কথা আর বলতে। চলুন, গরিবের বাড়িতে যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন, ভেতরে গিয়ে বসা যাক।'

'ভেতরে আর-একদিন যাব। বাই দি বাই, শুনলাম, আপনি নাকি একটা বাঘ পুষেছেন?'

'হ্যাঁ, সার্কাসে বাঘের খেলা দেখাতে দেখাতে আমার হ্যাবিটটাই এমন হয়ে গেছে যে, বাড়িতে এসেও বাঘ ছাড়া থাকতে পারলাম না। তাই একদিন ফণী নদীর ওপার থেকে ধরে আনলাম একটা বাঘের বাচ্চা।'

'কদ্দিন হলো?'

'তা প্রায় বছর চারেক হবে।'

'বাঘটাকে একবার দেখা যাবে?'

'আরে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। সে-কথা আর বলতে। আসুন আমার সঙ্গে।' বলেই তিনি বাড়ির পিছন দিকে চললেন, বাঁ পাখানি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। নিরঞ্জন সিংহ ও গণেশ হালদার তাঁকে অনুসরণ করলো।

বাড়ির পিছনে একটি খাঁচা। প্রকাণ্ড লোহার খাঁচা। সার্কাসে যেরকম থাকে, সেরকম। খাঁচার কাছে আসতেই সবার নাকেই বোঁটকা-বোঁটকা গন্ধ ঢুকলো।

বলাই পাল খাঁচার দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেন, 'ডগ।'

বাঘের নাম ডগ! কুকুরকে আদর করে লোকে অনেক সময়ে 'টাইগার' বলে ডাকে বটে কিন্তু কোনো বাঘকে 'ডগ' বলে ডাকতে গণেশ হালদার এই প্রথম শুনলো।

ডগ বলাই পালের সামনে এসে বিড়ালের মতন লেজ দোলাতে লাগলো। চার বছরেই সে বেশ তাগড়াই হয়ে উঠেছে। তার গলায় একটি মোটা চামড়ার বগলেস।

বলাই পালের পকেটেই খাঁচার চাবি ছিল। তিনি দরোজা খুলে দিলেন। ডগ বাইরে এসে তাঁর পায়ের ওপর শুয়ে পড়লো, আর বিড়ালের মতন গরর্-গরর্ শব্দ করতে করতে গা ফোলাতে লাগলো। এ-দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতো না গণেশ হালদার।

নিরঞ্জন সিংহ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলাই পালের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন আর গণেশ হালদার এগিয়ে গেল বাড়ির আরও বেশ খানিকটা পেছন দিকে। একটা ডোবার মধ্যে ও অসংখ্য হাড়গোড় আবিষ্কার করলো। বিকৃত দুটি নরমুণ্ডও গণেশ হালদার দেখতে পেল সেখানে। সেগুলোর মধ্যে থেকে ছোট্ট এক টুকরো হাড় ও কুড়িয়ে নিল। তারপর সেটা কাগজের মোড়কে পুরে পকেটস্থ করলো। ও যখন খাঁচার কাছে ফিরে এলো, নিরঞ্জন সিংহ তখনো বলাই পালের সঙ্গে গল্প করছে।

গণেশ হালদার এবার বাঘটির খুব কাছে এসে তার পায়ের থাবা-গুলি লক্ষ্য করলো। পাঁচটি করে নখ, সামনের পেছনের প্রতিটি থাবায়। বেশ অস্বাভাবিক। বলাই পালের খুঁড়িয়ে হাঁটার সঙ্গে এই অস্বাভাবিকতার কোথায় যেন যোগসূত্র আছে।

গণেশ হালদার বললো, 'আজ তাহলে চলি মিস্টার পাল। আবার দেখা হবে।'

'আরে নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, সে-কথা আর বলতে! দেখা তো হবেই। তবে গরিবের বাড়িতে একটু জলযোগ করে গেলে আনন্দ পেতাম অনেক বেশী।'

'আচ্ছা, সে হবে'খন একদিন। চল হে নিরঞ্জন।' গণেশ হালদারকে এসময় বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। অন্ততঃ ওর কথার সুরে তা প্রকাশ পেল।

যৌবনের বাংলোয় ফিরে এসেই গণেশ হালদার নিরঞ্জন সিংহকে বললো, 'আচ্ছা নিরঞ্জন, তোমার কেন মনে হয়েছে, অনিল-সুনীলকে বাঘে মারেনি—এটা একটু বুঝিয়ে বলবে ?'

'বাঘের শিকার ধরার কৌশলটা আমার ভালই জানা আছে। বিড়ালদের শিকার ধরা দেখেছ তো, অনেকটা সে রকম। বাঘ খুব ধীরে ধীরে, চুপি চুপি শিকারের কাছে এগিয়ে আসে। তারপর একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে শিকারের ওপর লক্ষ্য স্থির করে। এদিক-ওদিকেও একবার তাকিয়ে নেয়। তারপরই দেয় লাফ। এক লাফে শিকারের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে। তারপর শিকারটাকে মুখে কিংবা পিঠে নিয়েই লাফিয়ে লাফিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। ফলে, বাঘের আসা-যাওয়ার পায়ের ছাপের মধ্যে বিস্তর ফারাক ঘটে। ফিরে যাওয়ার সময় তার পায়ের ছাপের দূরত্ব ও গভীরতা দুই-ই বাড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে সে রকম কিছুই ঘটেনি। তা ছাড়া একটা বাঘ কখনো দু'জন মানুষকেও বয়ে নিয়ে যেতে পারে না।'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু একটা জিনিস তোমার নজর এড়িয়ে গেছে। পশুরাজের পেছনের পায়ের নখ। ভাল কথা, তোমার এখানে কোনো বাঘের ফটো আছে ?'

'আছে।' বলেই একটা অ্যালবাম নিয়ে এসে নিরঞ্জন সিংহ গণেশ হালদারকে দেখালো।

গণেশ হালদার প্রতিটি বাঘের পায়ের থাবাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর অ্যালবামটা নিরঞ্জন সিংহকে ফেরত দিল।

এবার গণেশ হালদার নিরঞ্জন সিংহের ওপর দুটো কাজের ভার দিল। এক নম্বর, বলাই পালের বাড়ির ডোবা থেকে সংগ্রহ করা হাড়ের টুকরোটা কলকাতায় ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেওয়া।

দু' নম্বর, স্থানীয় থানার ও. সি.-কে দিয়ে আজই বলাই পালকে অ্যারেস্ট করা।

নিরঞ্জন সিংহ বুদ্ধিমান লোক। ওরও সন্দেহটা পড়েছিল বলাই পালের ওপর। সেই সন্দেহের নিরসন করা ওর নিজের দ্বারা সম্ভব হয়নি বলেই গণেশ হালদারকে ডেকে এনেছে এখানে। বলাই পালের ওপর ওর সন্দেহের কারণ হচ্ছে, অনিল-সুনীলের সঙ্গে তার জমি নিয়ে পুরোনো ঝগড়া ছিল। একটা বাঘকে জ্যান্ত অবস্থায় বন্দী করার কৃতিত্ব অর্জন করে সেই অনিল-সুনীল খবরের কাগজের হেড-নিউজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লোকের মুখে মুখে তাদের নাম। বলা যায় না, সাহসিকতার জন্য তারা রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়ে যেতে পারে। তাহলে তো বলাই পালের একেবারে সাড়ে-সর্বনাশ! পঁচিশ বিঘে জমি তো আগে থেকেই নিয়ে আছে। তা যাক, সেটা না হয় বেনামী জমি। কিন্তু অঞ্চল-পঞ্চায়েতের সভাপতির পদটা পর্যন্ত যদি চলে যায়, তাহলে? তাই সে চালাকির আশ্রয় নিয়ে খুন করেছে অনিল-সুনীলকে। তারপর তাদের লাশগুলো কোথাও গুম করে রেখেছে। আর দোষটা গিয়ে পড়েছে কোনো কল্পিত বাঘের ওপর।

গণেশ হালদারের ওপর যথেষ্ট আস্থা আছে নিরঞ্জন সিংহের। তাই ওর কথায় কোনো প্রশ্ন না তুলে দু'জন নির্ভরযোগ্য লোককে দুটো কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দিল। লোক দুটো সঙ্গে করে নিয়ে গেল গণেশ হালদারের লেখা চিঠি।

বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যেই ও. সি. দেবব্রত দত্ত দু'জন কনেস্টবলকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন মৌবনের ফরেস্ট বাংলোয়। তারপর সেখানে চা-টা খেয়ে নিরঞ্জন সিংহ আর গণেশ হালদারকে নিয়ে রওনা দিলেন মাতোয়া গ্রামের উদ্দেশ্যে।

মাতোয়া গ্রামে তখন সবে একটা ভয়ঙ্কর লড়াই শেষ হয়েছে। বাঘে-মানুষে লড়াই। রোমান সম্রাটরা যে ধরনের লড়াই দেখতে ভালবাসতেন অনেকটা সে ধরনের লড়াই।

'ডগ'-এর খাঁচার মধ্যে ঢুকে একটু আগে তাকে আদর করছিলেন

বলাই পাল। আদরের মাত্রাটা হয়তো 'ডগ'-এর পক্ষে একটু বেশী হয়ে গিয়ে থাকবে। ফলে, 'ডগ'-এর পক্ষে তা সহ্য করা অসম্ভব হয়ে থাকবে। অথবা, নররক্তের স্বাদটা আর-একবার পাওয়ার জন্যও তার জিভটা রসিয়ে উঠে থাকবে। তাই বলাই পালের শরীরটা থাবার মধ্যে পেয়ে নিজেকে সে আর সংযত রাখতে পারেনি। নিজের স্বরূপটা প্রকাশ করে সে বলাই পালের ঘাড়টা দিয়েছে মটকে, টুঁটিটা দিয়েছে ছিঁড়ে। বলাই পাল খাঁচা থেকে বেরোনোর কোনো সুযোগই পাননি। চিৎকার করারও না। অসম্ভব রক্তক্ষরণের দরুন অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে।

বাড়ির কৃষাণ কালু সর্দার যখন বলাই পালের মৃতদেহটা প্রথম আবিষ্কার করে, তখন ডগ খাঁচার মধ্যে ছিল না। খোলা দরোজা দিয়ে বনের জীব বনেই হাওয়া হয়ে গিয়েছিল।

দেবব্রত দত্ত কিন্তু কালু সর্দারকে ছাড়লেন না। তাকে অ্যারেস্ট করে সদরে চালান দিলেন। আর বলাই পালের লাশটাকে পাঠিয়ে দিলেন পোস্টমর্টেম করার জন্য।

ওদিকে গণেশ হালদার বলাই পালের বাড়ির পেছন দিককার ডোবা থেকে আরও কিছু হাড়গোড়, আর বিকৃত নরমুণ্ড দু'টি বস্তায় পুরে পাঠিয়ে দিল কলকাতায়, অস্থি-বিশেষজ্ঞদের কাছে।

আদালতে কালু সর্দার সবই স্বীকার করলো। সে বললো, 'ফণী নদীর ধারে অনিল-সুনীলকে নিজের হাতে গুলি করে মেরেছিলেন বলাই পাল। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল কালু আর 'ডগ'। 'ডগ'-কে তিনি শিকল দিয়ে বেঁধে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন। নৌকায় চড়েই গিয়েছিলেন। তবে নৌকাটা বাঁধা ছিল প্রায় কোয়ার্টার মাইল ওপরে। কালু সর্দার দু'খেপে দু'টি লাশ নৌকার ওপর বয়ে এনেছিল। নৌকার ভেতরেই সেই লাশ দু'টো টুকরো টুকরো করে কাটা হয়েছিল। আর সবটুকু রক্তই খেতে দেওয়া হয়েছিল 'ডগ'কে। তারপর মাংসের টুকরোগুলো বস্তায় ভর্তি করে ফেললো। নৌকাটাকে মাতোয়ার আঘাটায় ভিড়িয়ে কালুই সেই মাংসের বস্তাটা বলাই

পালের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। 'ডগ' যতটা পেরেছিল সেই মাংস পেটভরে খেয়েছিল। বাকীটা মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়েছিল। নরমুণ্ড দুটোও পুঁতে ফেলা হয়েছিল। কিন্তু শেয়ালে মাটি খুঁড়ে তা তুলে ফেলেছিল।

অস্থি-বিশেজ্ঞদের রিপোর্টেও স্বীকার করা হ'লো, নরমুণ্ড দু'টি অনিল আর সুনীলেরই।

মূল আসামী বলাই পাল যদিও সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল, আদালতের বিচারে কালু সর্দারের কিন্তু উপযুক্ত শাস্তিই হ'লো। আর একদিক থেকে বলতে গেলে, মূল আসামী বলাই পালের উপযুক্ত শাস্তি তো আগেই হয়ে গেছে। তবে এই জঙ্গল-রহস্যের শেষ নায়ক, 'ডগ' নামক বলাই পালের পোষা রয়্যাল বেঙ্গলটিকে কোথাও আর পাওয়া গেল না। জঙ্গলের জীব জঙ্গলেই হারিয়ে গেল।

গণেশ হালদার কিন্তু জঙ্গল-রহস্যের এই শেষ নায়কটিকে ঠিকই চিনেছিল। চিনেছিল তার পেছন পায়ে একটা করে বাড়তি নখ দেখেই। তাই রহস্যটাও সহজেই ভেদ করতে পেরেছিল ও। অবশ্য 'ডগ'-এর পেছনের পা দুটোয় যদি পাঁচটির পরিবর্তে চারটি করে নখ থাকতো, তাহলে গণেশ হালদারের পক্ষে এই রহস্য কতদিনে ভেদ করা সম্ভব হ'তো, তা বলা মুশকিল।

আরও একটি খবর: অসম্ভব সাহসিকতাপূর্ণ কাজের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনিল দাস ও সুনীল দাসকে মরণোত্তর পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আকাশবাণীর স্থানীয় সংবাদে ঘোষণাটি শুনে গণেশ হালদার বেশ খুশীই হ'লো।

ভাবনায় পড়েছে গণেশ হালদার। মহা ভাবনায়। অবশ্য ভাববার সময়ও পেয়েছে অনেক। আজ তো সবে তিন তারিখ। ছ' তারিখের মধ্যে যা হয় একটা বলতে হবে ওকে। অতএব হাতে সময় আছে এখনও···।

যতটা পেরেছে কেসটার পজিটিভ-নেগেটিভ দুটো দিকই গণেশ হালদার খতিয়ে দেখেছে। প্রথমে নেগেটিভ দিকটাই ও দেখে নিয়েছে। সাধারণতঃ এরকমই ও করে থাকে। কেননা, ওর মতে উল্টো দিক থেকে আরম্ভ করার সুবিধে অনেক। যেমন, অন্ধকার থেকে আলোতে আসার সুবিধে যতটা, আলো থেকে অন্ধকারে যাওয়ার অসুবিধে ঠিক ততটা।···আসল কথা হচ্ছে, ওর স্বভাবটাই উল্টো। জানি না, সব ডিটেকটিভের চরিত্রই ওর মতন কি না। (আমি এখানে গল্পের বইয়ের ডিটেকটিভদের চরিত্র উহ্য রাখতে চাই। কারণ তাদের চরিত্রের সঙ্গে রক্তমাংসে গড়া গণেশ হালদারের তুলনাটা হাস্যকর হয়ে উঠতে পারে।)

যা বলছিলাম—প্রথমে গণেশ হালদার কেসটার নেগেটিভ দিকটা চিন্তা করে দেখেছে। খুন নয়, জালিয়াতি নয়, চোরাচালান নয়, গুপ্তচরের গুপ্তরহস্যও নয়। সত্যি কথা বলতে কি, রহস্য জাতীয় কোনো ব্যাপারই এটা নয়। অর্থাৎ ডিটেকটিভরা যে-সব বিষয় নিয়ে কারবার করে, সেরকম কোনো কিছুই নয়। 'লক-আউট' কি ডিটেকটিভের কাজের মধ্যে পড়ে?

অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, এই 'সনৎ কটন মিল'-এর স্লীপিং পার্টনার পঙ্কজ রায় বলছেন—হ্যাঁ, লক-আউট একটি অপরাধ—অমার্জনীয় অপরাধ, আর অপরাধ বলেই এর মধ্যে লুকিয়ে আছে রহস্য, অতএব এটা ডিটেকটিভের কাজের এক্তিয়ারের মধ্যেই পড়ে। একমাত্র ডিটেকটিভরাই পারে লক-আউট রহস্য ভেদ করতে।

পঙ্কজ রায় ছাড়া অন্য কেউ কথাগুলো বললে গণেশ হালদার হয়তো হেসেই উড়িয়ে দিত। 'সনৎ কটন মিল'-এর ফাইলটা বগলদাবা করে কখনোই বাড়িতে বয়ে আনতো না।

কেসটা 'সনৎ কটন মিল' নিয়েই। আজ তিন মাস ধরে মিলটা বন্ধ হয়ে আছে। সাত হাজার বাষট্টি জন কর্মচারী কর্মহীন। সাত হাজার বাষট্টিটি পরিবার আজ ধ্বংসের মুখে। কর্মচারীরা তাদের ইউনিয়ন মারফত ম্যানেজমেন্টের কাছে রিপ্রেজেনটেশন দিয়েছে। তারা ম্যানেজমেন্টকে অনুরোধ জানিয়েছে লক-আউট তুলে নিতে। সাত হাজার বাষট্টিটি পরিবার যাতে পথের ভিখিরীতে পরিণত না হয়, তারা তা ভেবে দেখতে বলেছে।

পঙ্কজ রায়, যিনি এতদিন জেগে ঘুমোচ্ছিলেন, এই রিপ্রেজেন-টেশনকে সেন্টিমেন্টে নিয়ে নিয়েছেন। স্বভাবতঃ তিনি শান্তিপ্রিয়, কোনো রকম ঝুটঝামেলা পছন্দ করেন না, কেবল গান-বাজনা নিয়ে থাকতেই ভালবাসেন। তা ছাড়া পয়সাকড়িরও অভাব নেই। অতএব জেগে ঘুমানোর কোনো অসুবিধাও ছিল না। আরও একটি কথা আছে—'সনৎ কটন মিল'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর কুশল রায়ের সততায় কর্ম-ক্ষমতায় তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই. কুশল রায় য দও তাঁর জ্ঞাতি ভাই, তবু তিনি কোনোদিন এই ছেলেটিকে শত্রু মনে করেননি। এক রকম বলতে গেলে, তাঁর ইচ্ছাতেই কুশল রায় ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়েছেন।

শ্রমিক-কর্মচারীদের চেঁচামেচিতে জেগে ওঠার (!) পর পঙ্কজ রায় যেন সম্পূর্ণ এক বিপরীত মানুষে পরিণত হয়েছেন। কর্তব্যে যে তিনি এত কঠোর হতে পারেন, মালিকপক্ষের কেউই তা ভাবতে পারেননি। তিনি আলাদা-আলাদাভাবে মালিক পক্ষের সকলের সঙ্গেই কথা বলেছেন, মিলটি খোলার জন্য তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন, আবার নিজের গাঁট থেকে আর্থিক সাহায্যের আশ্বাসও দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা অনড় অটল, সিদ্ধান্তে অবিচল। তাঁরা সাফ কথা জানিয়ে দিয়েছেন—অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, আর নয়। এবার যা করার পঙ্কজ রায়ই করুন।

পঙ্কজ রায় সন্দেহের দোলায় দুলতে থাকেন। যে কারবারে কোনো লাভ নেই, কেবল লোকসান আছে, কয়েক হাজার পরিবারকে বাঁচানোর জন্য তার জোয়াল কাঁধে নেওয়ার মানেই হ'লো নিজের পরিবারটিকে বানের জলে ভাসিয়ে দেওয়া।

অতএব একটি তদন্ত দরকার। বেসরকারীভাবে, গোপনে তিনি

একবার লক-আউটের আসল কারণটা তদন্ত করে দেখতে চান। অবশ্য ম্যানেজমেণ্টের টাকায় নয়, ব্যক্তিগত দশটি হাজার টাকা তিনি এজন্য বরাদ্দ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই টাকাটা তিনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ গণেশ হালদারের হাতে তুলে দিতে চান। আর এই কারণেই ওকে তিনি আজ সকালে নিজের ভবানীপুরের বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। ওর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনাও করেছিলেন। টাকাও অফার করেছিলেন। কিন্তু গণেশ হালদার টাকা না নিয়ে ফাইলটা নিয়ে এসেছে। কারণ ও একটু ভাবতে চায়। এজন্য তিন দিনের সময়ও চেয়ে নিয়েছে। তিন দিন পরে হয় ফাইলটা ফিরিয়ে দিয়ে যাবে, না হয় দশ হাজারের বাণ্ডিলটা সঙ্গে নিয়ে যাবে।

কাজেই ভাবছে গণেশ হালদার। সর্দার শঙ্কর রোডের পাঁচ নম্বর বাড়ির একতলার ফ্ল্যাটে বসে ও ভাবছে। কেসটার নেগেটিভ দিকটাই আগে ভাবছে। এটা যদি 'লক-আউট রহস্য' না হয়ে 'লকেট-রহস্য' হ'তো, তাহলে এতক্ষণে ও হয়তো একটা ক্লু-টু বের করে ফেলতো। কিন্তু এ যে রহস্য জগতের বাইরের এক আশ্চর্য রহস্য!

আশ্চর্য, কিন্তু অপরিচিত নয়। পশ্চিম বাংলার চারদিকে শুধু লক-আউট আর লক-আউট। অনেকে অনেক চেষ্টা করছেন লক-আউট বন্ধ করতে কিন্তু পারছেন না। ওপর মহলের অনেকে শিল্পে শান্তি ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু লক-আউটকে আউট করতে পারেননি পশ্চিম বাংলার মাটি থেকে। সম্ভবতঃ এই কারণেই পঙ্কজ রায় 'সনৎ কটন মিল'-এর কর্মচারীদের রিপ্রেজেনটেশনকে সেন্টিমেণ্টে নিয়ে থাকবেন।

হঠাৎ টেলিফোন যন্ত্রটি গুমরে উঠতেই গণেশ হালদারের ভাবনায় ছেদ পড়লো। ও রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে লাগাতেই ওপার থেকে ভেসে এলো অমর কুণ্ডুর গলা।

অমর কুণ্ডু হচ্ছে গণেশ হালদারের ক্লাসমেট। রাণাঘাট ইউসুফ ইনস্টিটিউশনে দু'জনে একই সঙ্গে পড়াশুনো করেছে। সাতান্ন সালে দু'জনে একই সঙ্গে স্কুল ফাইনাল পাস করেছে। দীর্ঘদিন

অমরের সঙ্গে গণেশ হালদারের দেখা-সাক্ষাৎ নেই। সেই অমর টেলিফোনে জানালো, অনেক কষ্টে সে গণেশ হালদারের ঠিকানা যোগাড় করেছে। গণেশ হালদারকে তার বিশেষ দরকার। সে আজই রাত আটটার সময় গণেশ হালদারের বাড়িতে আসছে। সে আরও জানালো, বর্তমানে সে বেকার। সে একটা কটন মিল-এ কাজ করতো। কিন্তু মাস তিনেক হলো মিলে লক-আউট হয়েছে। সেই থেকে হন্যে হয়ে চাকরির জন্য ঢুঁ মারছে এ-দরজায় ও-দরজায়। কিন্তু কোথাও সবুজ সংকেত পাচ্ছে না। তাই বাধ্য হয়ে…।

গণেশ হালদার অমরকে কথা দিল, আটটার সময় বাড়িতেই থাকবে।

আধ ঘণ্টাটাকও হয়নি। এমন সময় টেলিফোনটি ওকে যান্ত্রিক স্বরে ডাকতে লাগলো। হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিল ও।

এবার ফোন করলেন ডি সি (ডি ডি) সন্তোষ বিশ্বাস, যাঁর ওপর গণেশ হালদারের রয়েছে অগাধ বিশ্বাস। এই একটি মাত্র লোককে ও 'গুরু' বলে মানে।

সন্তোষ বিশ্বাস জানতে চাইলেন, একটি জটিল খুনের মামলায় গণেশ হালদার তাঁকে সাহায্য করতে পারবে কি না। গণেশ হালদার সাফ জানিয়ে দিল, না, ও পারবে না।

পঙ্কজ রায়ের উদ্দেশ্যকে মনে মনে তারিফ জানিয়েছে গণেশ হালদার। গণেশ হালদারের মতে তিনিই হচ্ছেন একমাত্র মালিক যিনি আন্তরিকভাবে চান লক-আউটকে নিজের প্রতিষ্ঠান থেকে উৎখাত করতে।

*　　　*　　　*

অমর কুণ্ডু এলো আটটার আগেই। গণেশ হালদার তখন একটি রহস্য পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল। এই পত্রিকাটিতে জনৈক তরুণ লেখক ওরই একটি কেস-হিস্ট্রি নিয়ে গল্প লিখেছেন। গল্পটিতে অনেক সত্যি ঘটনার বিকৃতি ঘটেছে, কিন্তু গল্পের গাঁথুনি তাতে শক্ত হয়েছে, সাসপেন্সও বেড়ে গেছে। নিজের কৃতিত্বের কথা পড়তে ওর বেশ

ভালই লাগছিল। ওর খুব জানতে ইচ্ছা হয় আর সব পাঠকদের কেমন লাগে।...অমর কুণ্ডু এলো ঠিক এই সময়টিতে।

গণেশ হালদার অমর কুণ্ডুর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলো।

অমর বললো, 'আমাকে চিনতে কষ্ট হচ্ছে?'

গণেশ বললো, 'তা একটু হচ্ছে। তোমার মাথায় পাকা চুল দেখবো এটা ভাবতে পারিনি।'

চা খেতে খেতে অমর কুণ্ডু নিজের সুখ-দুঃখের কথা বলতে লাগলো। ও যখন বললো যে 'সনৎ কটন মিল'-এ ও চাকরি করতো তখন গণেশ হালদার আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। গণেশের উৎফুল্ল ভাব দেখে অমর বেশ অবাক হ'লো।

অমরের কাছ থেকে মোটামুটি যা জানবার জেনে নিয়ে বললো, 'চল, এখনই একবার বড়বাজার যেতে হবে।'

'বড়বাজার কেন?' বললো অমর।

'একটা দরকারী ইনভেসটিগেশনে। জরুরী কেস হাতে রয়েছে। মজাটা দেখবে চল।'

অমর আর আপত্তি করলো না।

* * *

বড়বাজারের সবচেয়ে বড় গদিটির মালিক হচ্ছেন মনোজিৎ আগরওয়াল। ইনি হচ্ছেন গুজরাটী। কিন্তু এঁর ব্যবসার কেন্দ্র হচ্ছে কলকাতা। ভদ্রলোক বাংলা বলেন চমৎকার। খুব স্পষ্ট উচ্চারণ। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে ভুঁড়িটাকে বেশ দশাসই করে তুলেছেন।

গণেশ নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, 'আপনি কি সনৎ কটন মিলের সঙ্গে কানেকটেড ছিলেন?'

'ছিলাম বলছেন কি, এখনও আছি। ওরাই তো মশাই, আমাকে ডুবিয়ে রেখেছে। আমি মশাই, ওদের হোলসেল এজেন্ট। আমার মারফতে ওরা ওদের প্রডাকশন বাজারে ছাড়ে। কিন্তু মুনাফার অঙ্কটাকে বাড়াতে গিয়ে ওরাও মিলে লালবাতি জ্বালালো, আর আমাকেও পচা ডোবায় চুবিয়ে রাখলো।' একটু থেমে তিনি আবার

বলতে লাগলেন, 'কিছু মনে করবেন না, বাঙালীরা মশাই ধৈর্য ধরতে পারে না। আরে দাদা, মুনাফা তো আমরাও করি। কিন্তু অল্প অল্প ক'রে। আমরা বিশ্বাস করি, বিন্দু বিন্দু জল নিয়েই সমুদ্র হয়। সেই সোনার ডিমের গল্পটা জানেন তো? একটা হাঁস রোজ একটা করে সোনার ডিম পাড়তো। মালিক একদিনে বেশী ডিম পাওয়ার লোভে হাঁসটার পেট চিরে ফেললো। কিন্তু পেল কি? আমার বিশ্বাস হাঁসের মালিকটা বাঙালী ছিল। কিছু মনে করলেন না তো?'

'না, না, কি আবার মনে করবো?' বলেই গণেশ অমরের মুখের দিকে তাকালো।

মনোজিৎ কিছু খাবার আর কফি আনালেন। খাবারের মধ্যে বড় বড় সাইজের লাড্ডু আর পেঁড়া। খেতে খেতে গণেশ জিজ্ঞেস করলো, 'সনৎ কটন মিল কি বেশী দাম চাইছিল?'

'চাইছিল তো বটেই, কিন্তু চাইলেই বা দেবে কে? একে মানুষের অভাব বাড়ছে, তার ওপর আমেদাবাদের মিলগুলো আরও কম দামে বাজারে মাল ছাড়ছে। ভাল মাল। সনৎ কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর কুশল রায় বললো যে, ওর মিলের লেবার স্টাফ বেশী মাইনে দাবি করছে, বেশী বোনাস চাইছে। অতএব দামের রেট একটু বাড়াতে হবে। এদিকে আবার পাইকেররা আমাকে চাপ দিতে লাগলো দামের রেট কমাতে। পাইকেররা আমাকে শাসাতে লাগলো, দাম না কমালে তারা সনৎ মিলকে বয়কট করবে। বাধ্য হয়ে কুশল রায়কে কথাটা জানিয়ে দিলাম। ও তখন অন্য রাস্তা নিল। চার নম্বর মাল প্রোডাকশন করতে লাগলো। বেশী চালাকি করতে গেল।'

'চার নম্বর মাল!'

'ফোর্থ ক্লাস মালকেই বলে চার নম্বর মাল। আমার গোডাউনে গেলেই দেখতে পাবেন লাটকে লাট বোঝাই করা রয়েছে।'

গণেশ ও অমর মনোজিতের সঙ্গে গোডাউনটা ঘুরে দেখলো। সত্যিই সেখানে সনৎ কটন মিলের কাপড় লাট মারা রয়েছে। কিন্তু ফোর্থ ক্লাস কি না গণেশ বুঝতে পারলো না। অমর অবশ্য গণেশকে

জানালো আগের স্ট্যাণ্ডার্ডের মাল। এ-কথা মনোজিৎ শুনেই হেসে উড়িয়ে দিলেন। গণেশের ইশারায় অমর কোনো প্রতিবাদ করলো না।

এরপর গণেশ আর সেখানে অপেক্ষা করলো না। বিদায় নেওয়ার আগে কেবল দু'জন পাইকেরের নাম-ঠিকানা জেনে নিল। এঁরা হলেন বাংলার নিধীশ সাহা আর উড়িষ্যার নকুল সৎপথী।

নিধীশ সাহার গদিও বড়বাজারে। ইনি হচ্ছেন ফরিদপুরের লোক। এখন নবদ্বীপে বাড়ি করেছেন। চাকরি করবেন বলে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পড়েছিলেন। বার তিনেক ব্যর্থতার পর পাসও করেছিলেন। কিন্তু চাকরি আর করা হ'লো না। পিতার আদেশে এঁকে ব্যবসায় নামতে হলো। এঁর স্ত্রী অবশ্য চাকরিই করেন। উত্তর-বঙ্গের কোন শহরে ইস্কুলমাস্টারি করেন। ভদ্রমহিলা নাকি পতি-দেবতাকে ছেড়ে থাকতে পারেন, কিন্তু চাকরি নামক চক্রের বাইরে থাকার কথা কল্পনাই করতে পারেন না। আশ্চর্য!

গদিতেই ছিলেন নিধীশবাবু। ঝাঁপ বন্ধ করে হিসেব মেলাচ্ছিলেন। গণেশের পরিচয় পেতেই তিনি একটু ভয় পেয়ে গেলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে ভক্তিও করতে লাগলেন। গণেশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, 'সনৎ কটন মিলে'র কাপড়ের দাম আমরা কমাতে বলেছি, একথা ডাহা মিথ্যে। বরং ওই মনোজিৎ আগরওয়ালই বলেছে আমাদের বেশী দাম দিতে। তা না দিলে নাকি মিল আর কাপড় সাপ্লাই দিতে পারবে না। এই বলে সে আমাদের কাছে কাপড় বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওর গদিতে কাপড়ের পাহাড় সাজানো রয়েছে।'

ধন্যবাদ জানিয়ে গণেশ হালদার নিধীশবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিল। পথে ট্যাক্সিতে বসে অমর কুণ্ডু গণেশকে বললো, 'লক-আউটের ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক মনে হচ্ছে। কেননা, আমি জানি আমাদের মিলের ম্যানেজমেণ্টে কাপড়ের দাম বাড়ানোর কথা ইদানীং তোলেনি। তাছাড়া ওয়ার্কাররাও গত দু'তিন বছরে মাইনে বা বোনাস বাড়ানোর দাবি-টাবি জানায়নি।'

গণেশ হালদার গুম হয়ে বসে রইলো। ওর এই আচরণের অর্থ অমর কুণ্ডু বুঝতে পারলো না।

*　　　*　　　*

খাওয়া-দাওয়ার আগেই গণেশ নকুল সৎপথীকে ট্রাঙ্ককল করলো। সৎপথী জানালেন যে, সনৎ মিলের কাপড়ের চাহিদা উড়িষ্যায় খুবই ছিল। আর দাম কমানোর কোনো কথাই তিনি মনোজিতের কাছে পাড়েননি। মনোজিৎ মিথ্যা কথা বলেছেন। বরং মনোজিৎই তাঁকে উল্টে দাম বাড়াবেন বলেছেন। মতলব হচ্ছে এদিকেও গুড় খাওয়া, ওদিকেও গুড় খাওয়া।

খাওয়া-দাওয়ার পর গণেশ হালদার পঙ্কজ রায়কে ফোন করলো। কিছুক্ষণ হ'লো তিনি বাড়িতে ফিরেছেন। গণেশ বললো, 'আমি সনৎ কটন মিলের কেসটা হাতে নিলাম।'

'তোমার কথা শুনে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলাম ভাই। তা ক'দিন সময় লাগবে?'

'আশা করছি কাল সকালের মধ্যেই রহস্যটা ভেদ করতে পারবো।'

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে গণেশ অমরকে বললে, 'কার সঙ্গে কথা বলছিলাম জান? সনৎ কটন মিলের স্লীপিং পার্টনার পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে। তিনিই তো আজ সকালে সনৎ কটন মিলের কেসটা আমাকে দিয়েছেন।'

'সনৎ কটন মিলের কেস!'

'হ্যাঁ, তোমাদের মিলের লক-আউট রহস্যটা আমাকে ভেদ করতে দিয়েছেন।

'তুমি তা পারবে?'

'পারবো মানে! কাল সকালেই সব টের পাবে। ভাল কথা, কুশল রায় কি এখন নতুনগ্রামেই আছেন?'

'না, তিনি এখন এই কলকাতাতেই আছেন। রিচি রোডে তিনি একটা বাড়ি কিনেছেন। চল্লিশ নম্বর রিচি রোড।

*　　　*　　　*

পরদিন সকাল আটটার মধ্যেই কুশল রায়ের রিচি রোডের বাড়িতে এলো গণেশ হালদার আর অমর কুণ্ডু।

কুশল রায় যা বললেন অমর কুণ্ডু তা আগেই গণেশ হালদারকে জানিয়েছে। মিলের কাজকর্ম বেশ ভালভাবেই চলছিল। লেবার আনরেস্ট বলে কিছুই ছিল না। প্রোডাকসনও ভাল হচ্ছিল। কিন্তু গণ্ডগোল পাকালেন মনোজিৎ আগরওয়াল। তিনি বললেন যে, দাম কমাতে হবে, না হলে কাপড় কেউ কিনতে চাইছে না। আমেদাবাদের মিলগুলো নাকি খুব সস্তায় ভাল কোয়ালিটির কাপড় বাজারে ছাড়ছে।

গণেশ হালদার আর সময় নষ্ট না করে রিচি রোড থেকে সোজা চলে এলো ভবানীপুরে পঙ্কজ রায়ের বাড়িতে। ও সবকিছুই পঙ্কজ রায়কে খুলে বললো। তারপর ও বিরাট ডায়ালযুক্ত হাতঘড়িটা খুলে বাজাতে লাগলো।

'না, না, হাতঘড়ি বাজানো শুনে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এটা আসলে একটি টেপ-রেকর্ডার। হাতঘড়ির ডায়ালের আড়ালে ওই যন্ত্রটির অবস্থান। যন্ত্রটিতে ধরা পড়েছে মনোজিৎ আগরওয়াল, নিধাশ সাহা আর কুশল রায়ের স্টেটমেণ্ট।'

পঙ্কজ রায় টেপ আর ফাইলটা নিয়ে নিলেন। পরিবর্তে গণেশ হালদারকে দিলেন পনরো হাজার টাকার একটি তোড়া।

*   *   *

বাঙালীর একটি প্রতিষ্ঠান এ-ভাবে বেঁচে যাওয়াতে এবং গণেশ হালদারের এককালে প্রাণের বন্ধু অমর কুণ্ডু সহ সাত হাজার বাষট্টি জন কর্মচারী আবার কাজ পাওয়াতে গণেশ হালদার আনন্দে একেবারে আটখানা হয়ে গেল।

*   *   *

বিদায় নেওয়ার সময় অমর কুণ্ডু বললো, 'আবার আসবো।'

গণেশ হালদার বললো, 'নিশ্চয়ই। তবে তখন তোমাকে সপরিবারে দেখতে চাই। বাচ্চাদের অবিশ্যিই আনবে। যখন আসবে, বাড়িতে সাত দিনের জন্য লক-আউট ঘোষণা করে আসবে। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ!'